দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, উনি আসলে ভোটের ভিখারি — পৃঃ ১১

ধর্মীয় জনবিন্যাসে দ্রুত পরিবর্তন আনার একটি মাধ্যম লাভ জিহাদ —পৃঃ ১৫

৭১ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ৭ জানুয়ারি ২০১৯।। ২২ পৌষ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ২২ পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

৭ জানুয়ারি - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▪ ৫

তিন রাজ্যে কংগ্রেসের জয় সাময়িক ▪ ধীরেন দেবনাথ ▪ ৬

খোলা চিঠি : উনিশে বিজেপি ফিনিশ ▪ সুন্দর মৌলিক ▪ ৭

সদা সতর্ক শ্রদ্ধাবনত হয়ে থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয় ▪ দিলীপ সিনহা ▪ ৮

মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, উনি আসলে ভোটের ভিখারি ▪ সনাতন রায় ▪ ১১

কৃষিক্ষেত্রে ঢালাও ঋণমকুব অর্থনীতির অন্ধ গলি ▪ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▪ ১৩

ধর্মীয় জনবিন্যাসে দ্রুত পরিবর্তন আনার একটি মাধ্যম লাভ্ জিহাদ ▪ মাধবী মুখার্জী ▪ ১৫

'সরদারদের মারো, একজনও যেন বেঁচে না ফেরে' শিখ গণহত্যায় সজ্জন কুমারের নির্দেশ ▪ ড. জিষ্ণু বসু ▪ ২১

শিখ দাঙ্গায় প্রমাণ হয়ে গেল দাঙ্গা করে কারা এবং করায় কারা - কুখ্যাত সজ্জনকুমারের ফাঁসি নয় কেন? ▪ ২৩

চুরাশির শিখ গণহত্যা— কংগ্রেসের 'কালো হাতে' রক্তের দাগ ▪ অমিতাভ মিত্র ▪ ২৫

বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তাঁর শিকাগো জয় ▪ সংকর্ষণ মাইতি ▪ ৩১

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▪ সলিল গেঁউলি ▪ ৩৩

গল্প : যোদ্ধা ▪ পিন্টু ভট্টাচার্য্য ▪ ৩৫

গৌড়ের ঐতিহাসিক পাতালচণ্ডী সরকারি উদাসীনতায় নষ্ট হতে চলেছে ▪ তরুণ কুমার পণ্ডিত ▪ ৪৩

সেদিনের ফাঁসুড়ে দেখেছিল মৃতদেহকে ফাঁসি দেওয়ার প্রহসন ▪ অমিত ঘোষদস্তিদার ▪ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

অঙ্গনা : ১৭ ▪ **সুস্বাস্থ্য: ১৮** ▪ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▪ **চিত্রকথা : ৩৯** ▪ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ▪ **অন্যরকম : ৪২** ▪ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮** ▪ **রঙ্গম : ৪৯** ▪ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৪ জানুয়ারি ২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পৌষ পার্বণ

কথায় বলে, বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। কিন্তু তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পার্বণ কোনটি? এ প্রশ্নের একটাই উত্তর, পৌষ পার্বণ। এই পার্বণের কেন্দ্রবিন্দু মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান। যুগ যুগান্ত ধরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে এই পুণ্যস্নানের মাহাত্ম্য অক্ষয় হয়ে রয়েছে। যে কারণে সারা দেশের হিন্দুরা মকর সংক্রান্তির এই বিশেষ দিনটিতে উৎসব পালন করে থাকে। হিন্দু বাঙ্গালির ঘরে ঘরে চলে পুজোপাঠ, খাওয়া-দাওয়া, ঘর সাজানো। পিঠে আর পায়েসের গন্ধে ভরে যায় বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— পৌষ পার্বণ। লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

।। দাম একই থাকছে— দশ টাকা মাত্র।।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসের এক দুরপনেয় কলঙ্ক

মহীরূহের পতনে চতুর্দিকে কম্পন অনুভূত হইবেই, ইহাই স্বাভাবিক। বলিয়াছিলেন রাজীব গান্ধী। ইন্দিরা গান্ধী নিহত হইবার পর দিল্লি এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে উন্মত্ত কংগ্রেসি সমর্থকরা যখন নির্বিচারে শিখ নিধন করিতেছে—তখন সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে আড়াল করিবার জন্য ইন্দিরা-পুত্র এহেন আপ্তবাক্যটি আউড়াইয়াছিলেন। ওই একটি বাক্যেই পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল শিখ নিধন সম্পর্কে কংগ্রেস এবং তাহার সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কোনও অনুতাপই ছিল না। বরং এই ঘৃণ্য গণহত্যা কাণ্ডটিকে তাহারা পরোক্ষে প্রশ্রয়ই দিয়া আসিয়াছে। ১৯৮৪ সালে ওই শিখ নিধন সম্পর্কে কংগ্রেস যে আজও অনুতপ্ত নহে—তাহা সম্প্রতি আরও একটি ঘটনায় পরিষ্কার হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে জিতিয়া ক্ষমতা দখল করিবার পর রাজীব-তনয় রাহুল গান্ধী ওই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনখানি উপহার দিয়াছেন তাঁহার প্রয়াত পিতার ঘনিষ্ঠ সুহৃদ কমলনাথকে। শিখ নিধনে যেইসব কংগ্রেস নেতারা অভিযুক্ত এই কমলনাথ তাহাদের অন্যতম। ইন্দিরা গান্ধী নিহত হইবার পর এই কমলনাথের নেতৃত্বে একদল উন্মত্ত কংগ্রেস সমর্থক দিল্লির গুরুদ্বার রকাবগঞ্জে হামলা চালায়। কমলনাথের উপস্থিতিতেই এক বয়স্ক শিখ ব্যক্তি এবং তাহার পুত্রকে প্রকাশ্যে অগ্নিসংযোগ করিয়া হত্যা করা হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই তদন্ত কমিশনের সামনে কমলনাথকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। এহেন নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্বদানকারী এক ব্যক্তিকেই কংগ্রেসে সভাপতি রাহুল গান্ধী মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে বৃত করিয়াছেন। এইরকম এক ব্যক্তিকে একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনের জন্য বাছিয়া লওয়াতেই বুঝা যাইতেছে, কংগ্রেসের বিবেক বুদ্ধি কোনওকিছুই আজ পর্যন্ত জাগ্রত হয় নাই।

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার দুই খালিস্তানপন্থী শিখ দেহরক্ষীর হাতে নিজ বাসভবনেই নিহত হন। ইহার পর পরই সমগ্র দেশব্যাপী উন্মত্ত কংগ্রেসি সমর্থকরা শিখ নিধনে নামিয়া পড়ে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিখ নারী-পুরুষের উপর তাহারা আক্রমণ চালায়। বহু শিখ নারী-পুরুষকে হত্যা করা হয়। এই হিংস্র আক্রমণের হাত হইতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং শিশুরাও বাদ যায় নাই। শিখ পরিবারগুলির বাসস্থানে অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ কিছুই বাদ যায় নাই। সর্বাধিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল দিল্লি এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী শুধুমাত্র রাজধানী দিল্লিতেই তিন হাজার শিখ পুরুষ ও রমণী প্রাণ হারাইয়াছিলেন। দিল্লি সন্নিহিত অঞ্চলে হত্যা করা হইয়াছিল ২৮০০ শিখ পুরুষ এবং রমণীকে। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক সময় লাগিল এই হত্যাকাণ্ডের আরও এক নায়ক কংগ্রেস নেতা সজ্জনকুমারের সাজা ঘোষণা হইতে। এই শিখ নিধনের জন্য কংগ্রেস পরবর্তীকালে দায়সারা দুঃখপ্রকাশ করিয়াছে। আন্তরিকভাবে কংগ্রেস দুঃখিত—ইহা কখনও প্রমাণিত হয় নাই। যে কংগ্রেস নেতারা এই শিখ নিধনে জড়িত ছিলেন তাহাদের একজনকেও কংগ্রেস দল হইতে বহিষ্কার করা হয় নাই। বর্তমানে আদালতের রায়ে সজ্জনকুমার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে বাধ্য হইয়া কংগ্রেস তাহাকে বহিষ্কার করিয়াছে। আদালত যদি আরও দীর্ঘসূত্রতা করিত, তাহা হইলে সজ্জনকুমারের মতো ব্যক্তিকে কংগ্রেস আরও কিছুদিন তাহার নিরাপদ আশ্রয়ে সযত্নে লালন পালন করিত।

কংগ্রেসের শতবর্ষ প্রাচীন ইতিহাস হইতে শিখ গণহত্যার কলঙ্ক কখনও ঘুচিবে না। বরং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ইহাই জানিবে, একদিন নিরীহ শিখের রক্তে কংগ্রেসের হস্ত রঞ্জিত হইয়াছিল।

সুভাষিতম্

অজ্ঞানী নিন্দতি জ্ঞানং চৌরা নিন্দতি চন্দ্রমাঃ।
অধর্মা ধর্ম নিন্দতি মূর্খাঃ নিন্দতি পণ্ডিতান্।।

অজ্ঞানীরা জ্ঞানের নিন্দা করে, চোরেরা চাঁদের নিন্দা করে। অধম প্রকৃতির লোকেরা ধর্মের নিন্দা করে আর মূর্খরা পণ্ডিতদের নিন্দা করে।

তিন রাজ্যে কংগ্রেসের জয় সাময়িক

ধীরেন দেবনাথ

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে তিন রাজ্যে মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস বিজেপি-কে হারিয়ে জয়লাভ করেছে। কিন্তু বাকি দুটি রাজ্য তেলেঙ্গানা ও মিজোরামে পরাজিত হয়েছে। তেলেঙ্গানা কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়েছে অনেক আগেই। জয় থেকে এবারও বঞ্চিত। আর মিজোরামে দীর্ঘ ক্ষমতা ভোগের পর এবারই কংগ্রেস গদিচ্যুত হয়েছে। তবে লজ্জাজনক ঘটনাটি এই যে, এ রাজ্যে এক দশক ক্ষমতায় থাকার পর কংগ্রেস শুধু হারেইনি, মুখ্যমন্ত্রীকেও দেখতে হয়েছে হারের মুখ। এমনকী দুটি আসনেই বিপুল ভোটে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে তাদের। এরূপ ঘটনা অবশ্য ঘটেনি অন্য চার রাজ্যে। এ যেন 'ঢাকি শুদ্ধ প্রতিমা বিসর্জন'। আর সেই সুবাদে উত্তর-পূর্বঞ্চলের কংগ্রেস শাসিত শেষ রাজ্যটিরও পতন ঘটল। ফলে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন কংগ্রেস মুক্ত। প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসমুক্ত ভারতের যে ডাক দিয়েছেন, তার শুরু উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকেই। তবে এ ঘটনা কাকতালীয়ও হতে পারে। তবে কংগ্রেসের বিদায় আসন্ন।

অবশ্য পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন বিশেষত হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে এদেশের অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমের বিজেপি তথা হিন্দুত্ব বিরোধী প্রচার ছিল চোখে পড়ার মতো। এ ব্যাপারে সেকুলারবাদী মাধ্যমগুলির লাগাতার অপপ্রচারে অত্যুৎসাহ, উদ্দীপনা ও তৎপরতার অন্ত ছিল না। বহু পূর্ব থেকে বিজেপি বিরোধী এবং কংগ্রেসের 'কোলে ঝোল টানা' প্রচার অদ্যাবধি চলছে। হয়তো লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত চলবে। আর সেই অপপ্রচারের বিষয় হলো বিজেপি সরকারগুলির প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, নানা দুর্নীতি, অপশাসন, জনবিরোধী নীতিগ্রহণ, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য, হিন্দুত্ববাদী প্রচার ইত্যাদি। তার ওপর বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অনুন্নয়ন, ঋণগ্রস্ত চাষির আত্মহত্যা, গো-রক্ষকদের তাণ্ডব ও পিটিয়ে হত্যা ইত্যাদিও। পক্ষান্তরে, কংগ্রেসের গুণকীর্তন, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্ব, বক্তব্য, চালচলন, সেয়ানে সেয়ানে (রাহুল-মোদী) টক্কর ইত্যাদি প্রশংসাও। তবে ওই সব অপপ্রচারের ফলে ভোটারদের মধ্যে যে যথেষ্ট সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তাতে নেই কোনও সন্দেহ। তাই ওই তিন রাজ্যে বিজেপি শাসনের অবসানে ওই সব প্রচারমাধ্যমের অবদান অনস্বীকার্য। সত্যি বলতে কী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে গোয়েবলীয় মিথ্যাচার বা অপপ্রচার হিটলারকে প্রচুর সুবিধা ও সফলতা এনে দিয়েছিল। তাছাড়া কথায় তো আছে, তরবারির চেয়ে কলম অনেক বেশি শক্তিশালী।

তবে সেকুলারবাদের ধ্বজাধারী প্রচার মাধ্যমগুলি বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে যে ভরাডুবির খবর খবর প্রচার করেছে বাস্তবে তা সত্য নয়। কারণ মধ্যপ্রদেশে দু'দলের মধ্যেই লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। ২৩০ আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ১০৯টি এবং কংগ্রেসের ঝুলিতে গিয়েছে ১১৪টি। নির্দল ও বিএসপি-কে 'ম্যানেজ' করে কংগ্রেস হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিজেপি ভোট-শতাংশে এগিয়ে থেকেও হেরেছে। আবার মাত্র ৫০০ ভোটের ব্যবধানে ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে ২৬ জন প্রার্থীর। রাজস্থানে ১৯৯টির মধ্যে বিজেপি ৭৩, কংগ্রেস 'ম্যাজিক ফিগার' ১০৯ এবং অন্যরা পেয়েছে ২৫টি আসন। তবে বিজেপির অপ্রত্যাশিত হার হয়েছে ছত্তিশগড়ে। ছত্তিশগড়কে বিজেপির গড় বলা হতো এতদিন। জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিংহ টানা ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকলেও হার মেনেছেন এবার। ৯০ আসনের মধ্যে কংগ্রেস ও বিজেপি পেয়েছে যথাক্রমে ৬৭ ও ১৫। মিজোরামে কিন্তু বিজেপির 'বাড়া ভাতে ছাই' দিয়েছে 'নোটা'। পাঁচ রাজ্যে 'নোটা'র পক্ষে ভোট পড়েছে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ। এর কিছু ভোট বিজেপির বাক্সে পড়লে তার ফল অন্য রকম হতো। বিজেপি ধরে রাখত ওই তিন রাজ্য। অবশ্য আজ যারা বিজেপির পরাজয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর তাদের জোড়হস্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে। কারণ কংগ্রেসের এই জয় সাময়িক।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ওই তিন রাজ্যে বিজেপি অভাবনীয় ফল করবে। রাজ্যস্তরে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, রাজ্যস্তরের কিছু বিজেপি নেতার মধ্যে ব্যক্তিগত কোন্দল, আত্মসন্তুষ্টি, জনগণের মধ্যে সরকার বিরোধী কিছু ক্ষোভ-বিক্ষোভ বিজেপির হারের মুখ্য কারণ হলেও, লোকসভা নির্বাচনে তারাই আবার মোদীর দলকেই ভোট দেবে। কারণ জনপ্রিয়তার নিরিখে নরেন্দ্র মোদী আজও অন্যান্য নেতা-নেত্রীর থেকে বহু এগিয়ে। রাষ্ট্র পরিচালনা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রতীক মোদীর নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখছে জনগণ। তাছাড়া ওই তিন রাজ্যের ভোটাররা লোকসভা ও বিধান সভায় একই দলকে জেতায় না। আর এসব কথা যদি সত্যি হয় তবে আগামী লোকসভা নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় আসছে এনডিএ, যার নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। ■

উনিশে বিজেপি ফিনিশ

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

শুভ নববর্ষ। ২০১৯ ভালো কাটুক দিদি। ভোট টোট যাই থাকুক জানি আপনি ভালো থাকবেন। আসলে বছরের শুরুতেই যে ভাবে মাঝ রাতে সাইরেন বাজালেন তাতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে উনিশ নিয়ে আপনি আশাবাদী।

কিন্তু দিদি, শেষ মানেই তো শেষ নয়। রেশ তো থেকেই যায়। সময় তো বাক্য নয় যে দাড়ি টেনে দিলেন আর শেষ হয়ে গেল। তাই ২০১৮-র ক্যালেন্ডার বাসি হয়ে গেলেও রেশ তো থেকেই যাবে। আর সেই রেশ থেকে গেল আদালতে। বছর শেষের ছুটি কাটিয়ে কোর্ট খুললেই ফিরে আসবে পুরনো মামলা। তখনই মালুম হবে যাহা আঠারো, তাহাই উনিশ।

বছরের গোড়ায় বাঙ্গালিকে হাইকোর্ট দেখানো শুরু করিয়ে দিয়েছিলেন আপনি। পঞ্চায়েত নির্বাচন। ভোটের আগে, ভোটের দিনে, ভোটের পরে আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছে রাজ্যকে। জনতার আদালতের থেকে বড়ো ভূমিকা নিয়ে নেয় কোর্ট। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেও শপথ নিতে নিতে মাস গড়িয়ে গিয়েছে আপনার ভাইদের। হাইকোর্ট টপকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ পেয়ে তবেই না শপথের ছাড়পত্র মিলেছে।

এর পরে ডিএ মামলা। মহার্ঘ ভাতার লড়াই চলছে তো চলছেই। ডিএ নাকি রাজ্যের দয়ার দান তারা যতটা পারবে ততটাই দেবে। এক মত স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালও। শুরু হয় মামলা। একটা একটা করে ৩৮টা শুনানির শেষে হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত ও শেখর ববি শরাফের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দেয় ডিএ রাজ্য সরকারি কর্মীদের অধিকার। কিন্তু মামলা মিটল না। আবার ফেরৎ গেল স্যাটে। সেখানে শুনানি চলছে। কী হবে কেউ জানে না। আর সেই মামলার মধ্যেই বাঙালি পেয়ে গেল নতুন মামলা। ওদিকে দিদি ষষ্ঠ বেতন কমিশনের কোনও দেখা নেই। আপনি দেবেন দেবেন করে যাচ্ছেন আর অন্য দিকে কমিশনের মেয়াদ বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

এর পরে রথযাত্রা। ২০১৮-র শেষ ভাগটুকু তো রথ-মামলায় মেতে রইল রাজ্যের রাজনীতি। রাজ্য সরকার বনাম বিজেপির মামলায় রথ ঘুরল সিঙ্গল বেঞ্চ থেকে ডিভিশন বেঞ্চে। সেখান থেকে আবার ফিরল সিঙ্গল বেঞ্চে। আজ এর স্বস্তি তো কাল অস্বস্তি। শেষে সেই মামলাও সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে ছুটি কাটাচ্ছে।

সব মিলিয়ে যে তিনটি মামলার উল্লেখ করা হলো সবটাতেই দিদি আপনার জয় হোক। কিন্তু দিদি এই তিন জয়ে যে আপনার তিন পরাজয় লুকিয়ে রয়েছে।

১. পঞ্চায়েত নির্বাচনের যত মামলা তাতে আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন গায়ের জোর ছাড়া ঘাসফুলের জয় সম্ভব নয়।

২. ডিএ মামলায় আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের নায্য পাওনা নিয়ে গড়িমসি করলেও আপনার ভুলভাল খাতে টাকা খরচে কোনও কার্পণ্য নেই।

৩. রথযাত্রা। শেষ কিন্তু এটাই প্রধান। এই মামলায় আপনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আপনার প্রশাসনের একটা রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি সামলানোর ক্ষমতা নেই। তার থেকেও বড়ো কথা উনিশের ভোটের আগে আপনি বিজেপিকে ভয় পাচ্ছেন। খুব ভয় পাচ্ছেন।

— **সুন্দর মৌলিক**

অতিথি কলম

সদা সর্বদা শ্রদ্ধাবনত হয়ে থাকাটা যুক্তিযুক্ত নয়

দিলীপ সিনহা

চীন এই মুহূর্তে যে আপাতভাবে মিলমিশের ভাব দেখাচ্ছে সেই সুযোগে আমাদের দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বৈষম্যকে কিছুটা ঠিকঠাক করে নেওয়ার সুযোগ নেওয়া উচিত।

সংসদের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি সম্প্রতি তাদের পর্যবেক্ষণে চিন্তা ব্যক্ত করে বলেছে যে, ভারত সরকারের চীনের প্রতি চিরাচরিত সমীহ করে চলার বিদেশ নীতির কোনও প্রত্যাশিত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া চীনের তরফে আদৌ দেখা যায় না। পঞ্চাশের দশকে ভারতের পক্ষ থেকে চীনের আগ্রাসন নীতির কোনও প্রতিবাদ না থাকায় তারা বিনা বাধায় তিব্বত দখল করে নেয়। অতি সম্প্রতি তাদের সম্প্রসারণের মানসিকতার ক্ষেত্রেও ভারতের মুখ বুজে থাকা নজরে পড়ছে।

চীন কিন্তু ভারত যাতে খুব বেশি চটে না যায় সে ব্যাপারটা খেয়াল রাখছে। তাদের বরাবরের 'নিজের শক্তি লুকিয়ে রেখে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকো' নীতি নিয়ে চলছে। কেননা এক সঙ্গে অনেকগুলো ফ্রন্ট খুলে ফেলা তাদের উদ্দেশ্য নয়। যেদিন থেকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তাদের সঙ্গে 'বাণিজ্য যুদ্ধ' চালাবার হুংকার দিয়েছেন তখন থেকে তাঁর চরিত্রের চট করে আন্দাজ করা যাবে না এমন প্রবণতার কথা চীন বুঝতে পেরেছে। সেদিন থেকেই তারা ভারতকে নিয়ে পড়েছে। মার্কিন জুজুর পরিপ্রেক্ষিতে তারা ডোকালাম ধরনের সংঘর্ষের ভয় দেখানোর হঠকারী নাটকের থেকে সরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন জোগাবার চেষ্টা করছে। যার পরিণতিতেই হুয়াংয়ে রাষ্ট্রপতি জি জিমপিংয়ের সঙ্গে দু'দিনের শীর্ষ বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিল।

গত সপ্তাহে একটি ভারতীয় দৈনিকে লেখা তাঁর নিবন্ধে চীনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াংই একটি এমন পাঁচ দফা ভবিষ্যতের দিশা নির্দেশ দিয়েছেন যা দেখে অতীতের পঞ্চশীল নীতির প্রবক্তাদের গর্ববোধ হতে পারে। তিনি প্রতিবেশী দেশগুলির পারস্পরিক রাজনৈতিক বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন। একই সঙ্গে আঞ্চলিক শান্তি রক্ষা ও নিজ নিজ দেশে সংস্কার নীতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাও উল্লেখিত হয়েছে।

অবশ্য এগুলির কোনোটিই অসাধারণ বা অশ্রুতপূর্ব তো নয়ই, বরং কিছুটা অতি চর্বিত। কিন্তু এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে কৌশলের বীজ। চীনের দীর্ঘদিনের আহ্লাদি পরিকল্পনা 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' যার সারকথা বিভিন্ন দেশের মধ্যে দিয়ে রাস্তা তৈরি করে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ অবধি নিজেদের গতিবিধি সুগম করা। সারা বিশ্বকে নিজস্ব পরিধির মধ্যে আনার এই পরিকল্পনা এখন বিতর্কের মুখে পড়েছে।

চীনে যে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়েছে তা তাদের নিজেদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই পরিষ্কার। এমনকী দেশের অভ্যন্তরে শাসক সম্প্রদায়ের অভিজাত অংশের মধ্যে রাষ্ট্রপতি জি জিমপিংয়ের কার্যপদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে, এটা একরকম ঠিকই হয়ে গেছে যে, আমেরিকার সঙ্গে কিছু সমঝোতা করে নিয়ে পুরো মাত্রার 'বাণিজ্য যুদ্ধ' এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। চীন এটা অস্বীকার করতে পারছে না যে, মার্কিনদেশেই তাদের সবচেয়ে বড়ো রপ্তানি বাজার। ট্রাম্পের লালচোখ দেখানোর নীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে চীনে ইতিমধ্যেই আমেরিকা থেকে আমদানিকৃত গাড়ির ওপর মাশুল অনেকটাই কমানো হয়েছে। চীন আরও বেশি পরিমাণে কৃষিজাত পণ্য মার্কিনদেশ থেকে কিনছে। ট্রাম্প কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাপারে এখনও অনমনীয়। এই সূত্রে অতি সম্প্রতি তিনি একটি বিল আইনে পরিণত করেছেন। যার ফলে চীনকে তিব্বতে মার্কিন নাগরিকদের যাতায়াতের জন্য রাস্তা খুলে দিতে হবে, বিনিময়ে চীনারাও আমেরিকা ভ্রমণ করতে পারবে। এই বিষয়ে চীনের প্রতিক্রিয়া খুব একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ নয়।

ভারতের কিন্তু তার উত্তর দিকের প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কটা তুল্যমূল্য করে নেওয়ার এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। সংসদীয় কমিটি তার নির্দেশে বলেছে কিছুটা 'খোলামেলা দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে চলা দরকার। সব ধরনের বিকল্প ব্যবহার করা যেতে পারে যার মধ্যে তাইওয়ানের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টাও আসবে। কোনও শত্রুতার মনোভাব যেন সৃষ্টি না হয়। উপদেশটি সৎ। ভারতের কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে নিজেদেরই চাপানো যে তিনটি বিধি নিষেধ যেমন বাণিজ্য, তাইওয়ান ও তিব্বত নিয়ে আরও নমনীয় হওয়ার সুযোগ আছে।

চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থায়ী সদস্য হওয়ার সুবাদে ও নিজেদের কিছু ধামাধরা দেশকে হাত করে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বহু ওয়েবসাইটে ভারতের অরুণাচল প্রদেশকে বিতর্কিত অঞ্চল বলে দাগিয়ে দিয়েছে। এটা কিন্তু ভারতের তরফে চীনের সব শর্ত মানার পরও ঘটছে। শুধু তাই নয়, চীনের তীব্র বিরোধিতার ফলে বিশ্বের পরিচিত

দেশগুলির মধ্যে তাইওয়ানই একমাত্র দেশ যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মান্যতা পায়নি। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি আমেরিকার থেকেও বাড়তি উদ্বেগের কারণ। মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ঘাটতির থেকে চীনের সঙ্গে ঘাটতি অনেক জটিল।

আমেরিকা ও ভারত উভয়েই চীন থেকে যা আমদানি করে তার মাত্র ২৫ শতাংশই তারা চীনে রপ্তানি করতে পারে। কিন্তু আমেরিকান সংস্থাগুলি চীনে অবস্থিত তাদের কারখানায় উৎপাদিত পণ্য সেখানে বিক্রি করে ভারসাম্য রক্ষার যে সুযোগ পায় ভারতের সে সুযোগ নেই। প্রসঙ্গত, ২০০১ সাল থেকে ডব্লিউটিও-তে যোগ দেওয়ার পর থেকে ভারতে চীনের রপ্তানি ৩০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই একই সময়ে সারা বিশ্বে তাদের রপ্তানি বৃদ্ধির হার মাত্র ৮ গুণ বেড়েছে। অথচ ভারতের এস এম ই সেক্টর (ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোগ) সস্তা চীনা মালের আমদানির দাপটে ভয়ংকর সংকটে পড়েছে। আমাদের দেশের বাজার চীনা আমদানিকৃত পণ্যে ছেয়ে গেছে। পরিণতিতে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র প্রকল্প বিদ্রূপের মুখে। অন্যদিকে ভারত থেকে চীনে রপ্তানি করা বিশেষ করে উৎপাদিত (ফিনান্সিয়াল প্রোডাক্ট) পণ্য সামগ্রীর ওপর চড়া শুল্ক চাপানো হয়েছে। অতীতের উপনিবেশিক কায়দা মেনে চীন ভারত থেকে কেবলমাত্র কাঁচা মাল কিনে নিজের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করে অর্থাগম জারি রাখে।

মনে রাখা দরকার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে বিষম বৈষম্য এভাবে চললে কোনওদিনই সংশোধিত হবে না। হ্যাঁ, আমাদের দেশে চীনা পণ্যের অতিকায় আন্তর্জাতিক ই-রিটেইলারের বাড়বাড়ন্ত হবে। এরই ফলস্বরূপ বাড়ি বাড়ি সেই মাল পৌঁছে দেওয়ার জন্য কিছু নগণ্য মাইনের সরবরাহকর্মীর চাকরি জুটবে। এটি নিশ্চিত ভাবেই অগ্রহণীয় একটি বাণিজ্যিক মডেল যেটি মেনে নিলে ভারতের অভ্যন্তরে গভীর সামাজিক অসন্তোষ তৈরি হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ঘাটতি মেটাতে চীনা কোম্পানিগুলিকে এখানে ডেকে এনে কারখানা খোলানোর নীতি নেওয়া হয়েছে। এটির পরিণতিও ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনা কম। ছুটকোছাটকা কিছু কেম্পানি এখানে এসে তাদের মাল সন্নিবিষ্ট করার কতিপয় সংস্থা খুলতে পারে। তাতে ভারতীয় কোম্পানিগুলির আখেরে কোনও অর্থনৈতিক সুরাহা হবে না, উল্টে এদেশে ঢুকে থাকার পরিণামে দীর্ঘমেয়াদে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার প্রশ্ন উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সেই কারণে চীনের সাম্প্রতিক কিছুটা মিটমাটের পরিস্থিতি তৈরি করার হাবভাব দেখানোর আবহের সুযোগ নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বৈষম্যগুলি কাটিয়ে ওঠার আলোচনা করা যেতে পারে। তাইওয়ানের সঙ্গেও যাতে আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয় সে ব্যাপারে চীনকে উদ্যোগী করা জরুরি। তিব্বতকে পর্দার যে আড়ালে ঢেকে রেখেছে চীন তার কিছুটা অপসারণের প্রসঙ্গও আসতে পারে।

ভাবলে অবাক হতে হবে, ভারতে বসবাসকারী তিব্বতীয়রা কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আজ অন্যতম বিস্মৃত উদ্বাস্তু। ভারত মায়নামারকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ফেরানোর জন্য আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু চীনের সঙ্গে তিব্বতীয় উদ্বাস্তু নিয়ে কখনও মুখ খোলেনি। আর তিব্বতের স্বায়ত্তশাসনের কথা তোলা তো দূরের কথা, এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই চীন যখন তিব্বতকে অধিগ্রহণ করল ভারত উচ্চবাচ্চ করেনি।

সংসদীয় প্যানেল চিন্তাভাবনা করে যে নির্দেশগুলি দিয়েছে সরকার সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিলে ভালো করবে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার নানাবিধ নিদান সেখানে লেখা রয়েছে।

(লেখক পূর্বতন সরকারি কূটনৈতিক)

ভারতে বসবাসকারী তিব্বতীয়রা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বিস্মৃত উদ্বাস্তু। ভারত মায়নামারকে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের ফেরানোর জন্য আপ্রাণ লড়ে যাচ্ছে। কিন্তু চীনের সঙ্গে তিব্বতীয় উদ্বাস্তু নিয়ে কখনও মুখ খোলেনি। তিব্বতের স্বায়ত্তশাসনের কথা তোলা তো দূরের কথা, এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই চীন যখন তিব্বতকে অধিগ্রহণ করল তখন ভারত উচ্চবাচ্চ করেনি।

রম্যরচনা

পল্টুর জীবনের লক্ষ্য

শিক্ষক : পল্টু, বড়ো হয়ে তুমি কি করতে চাও?
পল্টু : ফেসবুক করতে চাই স্যার।
শিক্ষক : আহ্, আমি জানতে চাইছি বড়ো হয়ে তুমি কী হতে চাও?
পল্টু : বললাম তো স্যার, ফেসবুক ইউজার।
শিক্ষক : আশ্চর্য! ফেসবুক ইউজার হয়ে তুমি কী পাবে?
পল্টু : লাইক, কমেন্ট।
শিক্ষক : তোমার বাবা-মা তোমার কাছে কী চান?
পল্টু : আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড স্যার।
শিক্ষক অজ্ঞান!

* * *

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়

পল্টু মামাবাড়ি গিয়েছে।

মামা পল্টুকে জিগ্যেস করলেন— হ্যাঁরে পল্টু, তোর এবার কোন ক্লাস হলো?

পল্টু : ক্লাস ফাইভ। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়।

মামা : গত বছরও তো ক্লাস ফাইভেই ছিলি।

পল্টু : এবছরও তাই। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়।

মামা : তার মানে ফেল করেছিস?

পল্টু : হ্যাঁ। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়।

মামা (রেগে গিয়ে) : বারবার এরকম 'অনুপ্রেরণায়, অনুপ্রেরণায়' বলছিস কেন?

পল্টু : কী করব? বাবা যে সেদিন পাড়ার মোড়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলল— যা হচ্ছে, যা হবে সবই মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়।

মামা অজ্ঞান।

আন্দামানে ইতিহাস গড়লেন মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বছরের শেষে ইতিহাস গড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৭৫ বছর আগে ১৯৪৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সৈন্যকে পরাজিত করে আন্দামানে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দ্বীপের নাম রেখেছিলেন শহিদ এবং স্বরাজ দ্বীপ। স্বাধীন ভারতের কোনও সরকারই নেতাজীর দেওয়া নাম চালু করেনি। নরেন্দ্র মোদী সেই কাজটাই করেছেন। গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে তিনি নীল দ্বীপের নাম রেখেছেন শহিদ দ্বীপ আর হ্যাভলক দ্বীপের স্বরাজ দ্বীপ। এছাড়া রোজ আইল্যান্ডের নাম রাখা হয়েছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নামে।

উবাচ

" ২০০৯-এর ভোটের আগে যাঁরা ভোটারদের কৃষিঋণ মকুবের ললিপপ দিয়েছিলেন, তাতে কৃষকরা কতখানি লাভবান হয়েছিলেন? "

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

কৃষিঋণ মকুব সমস্যার সমাধান নয় প্রসঙ্গে

" ইডি যা জানিয়েছে তাতে দেশ স্তম্ভিত। তাদের কথানুযায়ী ক্রিশ্চিয়ান মিচেল অগুস্টাওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারিতে শ্রীমতী গান্ধীর নাম করেছেন। "

প্রকাশ জাভড়েকর
কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী

হেলিকপ্টার কেলেঙ্কারিতে গান্ধী পরিবারের যুক্ত থাকা প্রসঙ্গে

" যিনি বিরোধী জোটের ওয়াগান চালাবেন, তাঁর শিক্ষানবিশি লাইসেন্সও নেই। "

মুখতার আব্বাস নকভি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

রাহুল গান্ধীর বিরোধী জোট তৈরির প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে

" ফসল বিমা, অটল গ্রামসড়ক যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির নাম বদল করে নিজের নামে চালিয়ে কৃতিত্ব নিতে চাইছে তৃণমূল সরকার। "

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপির সভাপতি

রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্যে

" লোকসভায় কংগ্রেস তিন তালাক বিরোধী বিলের সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু রাজ্যসভায় বিরোধিতা করছে। এটি রাজনৈতিক নাটক ছাড়া আর কিছু নয়। "

বিজয় গোয়েল
কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী

রাজ্য সভায় তিন তালাক বিলের বিরোধিতা প্রসঙ্গে

মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, উনি আসলে ভোটের ভিখারি

সনাতন রায়

না, হয়তো আপনার কিছু এসে যাবে না যদি পরিসংখ্যান তথ্য দিয়ে বলি, গোটা বিশ্বে প্রতিবছর ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলমান জনসংখ্যা বাড়ছে ১.৮ শতাংশ হারে যেখানে গোটা বিশ্বে গড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১ শতাংশ।

না, আমি জানি, আপনি হয়তো চমকে উঠবেন না, যদি পরিসংখ্যান তথ্য ঘেঁটে দেখেন, ২০০১ থেকে ২০১১, এই দশকে ভারতবর্ষে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৬.৮ শতাংশ। কিন্তু মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ওই একই দশকে ২৪.৬ শতাংশ। জানি, আপনি শান্তিতেই চোখ বুজে সব ঠিক হ্যায় বলে সুখস্বপ্ন দেখবেন, যদি আপনার কানের কাছে উচ্চস্বরে বলি, ও মশাই, শুনছেন? পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ২০১৩ সালে এ রাজ্যে জনসংখ্যা ছিল ৯৩ মিলিয়ন মানে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ। আর ম্যাজিকের মতো ২০১৮ ফুরোতে না ফুরোতেই সেই জনসংখ্যা ৯ কোটি ৫১ লক্ষ ছুঁইছুঁই। তার মধ্যে মুসলমান কত শুনবেন? প্রায় ৩৪ শতাংশ! জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন জানেন? শুনুন, তাঁরা বলছেন, ১৯৫১ থেকে ২০১১ এই ছয় দশকে এ রাজ্যে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে গড়ে ৭.১৫ শতাংশ হারে। পরের ৭ বছরে ওই হার বাড়বে বছর প্রতি এক শতাংশ হারে অর্থাৎ এক দশকে যা গিয়ে দাঁড়াবে ১০ শতাংশ বা তার বেশি।

জানি, আপনার কাছে এ তথ্যেরও কোনও মূল্য নেই। যদি বলি, যেসব হাভাতে পরিবারের মুসলমান মায়েদের জন্য আপনার প্রাণ কাঁদে, কারণ তাঁরা নাকি অপুষ্টির শিকার, সেই মায়েদের প্রজনন ক্ষমতা বা সন্তান ধারণের ক্ষমতা গড় মা প্রতি ৩.২। অর্থাৎ প্রতি মা গড়ে অন্তত তিন শিশুর জন্ম দিচ্ছেন। হিন্দু মা জন্ম দিচ্ছেন আড়াই জনের। আজ্ঞে হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গই হলো সেই রাজ্য যার রাজধানী কলকাতায় বসবাস করেন প্রায় ৯ লক্ষ ৪০ হাজার মুসলমান। অর্থাৎ রাজধানীর মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশেরও বেশি। এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারতবর্ষে সবচেয়ে দ্রুততম হারে বাড়ছে (চক্রবৃদ্ধি হারের মতো) যে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ তা হলো মুসলমান।

আর যদি এরকমই চলতে থাকে, তাহলে এখন গোটা দেশে যেখানে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গড়ে বছরে ৩৫ শতাংশ, ২০৫০ সালে সেই বৃদ্ধির হার হবে ৭৩ শতাংশ। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষ হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ (Pew Research Centre, US) আর পশ্চিমবঙ্গ ওই সময়ের মধ্যেই পরিণত হবে মুসলমান প্রধান রাজ্যে। আপনার এই সব সংখ্যাতত্ত্বে কিছু যাবে আসবে না। কারণ আপনি ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক সদস্য, রাজনীতিবিদ কিংবা সবজান্তা বুদ্ধিজীবী। ধর্মনিরপেক্ষতা আপনার আড়ম্বর এবং আপনি বোঝেন, কিছু কর্ম না করেই পেটের ভাত জোটাতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতা হলো সবচেয়ে ভালো কর্ম।

বাঃ বেশ! তাহলে আরও কিছু তথ্য দিই এবং তা আপনার এবং আমার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নিয়েই। ২০১৩ থেকে ২০১৮ এই পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পরিবেশে মুসলমান অপরাধীদের হাত ধরে মোট অপকর্মের ঘটনা ঘটেছে ৪৩৭টি। ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ এবং মৃত্যুর মতো ঘটনা ৮/১০টির বেশি না হলেও বাকি অপরাধগুলোও আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবেই স্বীকৃত। যেমন টাকা জাল করা, জালনোট পাচার করা, জালনোট বাজারে চালানো, জাল পাসপোর্ট তৈরি করা, রাতের অন্ধকারে বিদেশি অনুপ্রবেশ ঘটানো, মেয়ে পাচার থেকে গোরু পাচার— সব ধরনের চোরাচালান ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে জোর করে ধর্মান্তরকরণ, মিথ্যা পরিচয়ে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করা এবং নির্যাতন করা, বিষমদ বিক্রি করা, ভাগাড়ের পচা মাংস গোটা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা রেস্তোরাঁ এবং হোটেলে চালান করা, হিন্দু মহিলাদের গণধর্ষণ, ডাকাতি, সুপারি নিয়ে খুন করা, পকেটমারি, রাহাজানি এবং সর্বোপরি যে যখন ক্ষমতায় থাকে, রাজনৈতিক ভাবে ভাড়াটে গুন্ডার ভূমিকা নেওয়ার মতো ভয়াবহ সব অপারাধ যে অপরাধের নায়ক আপনার চোখে 'মানুষ' মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী। হিন্দু অপরাধী? নগণ্য। এই জনগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ কিন্তু বিদেশি— একথা শুনলে আপনি গোঁসা করবেন হয়তো। কিন্তু চোখ দিয়ে মনকে না ঠেরে স্বীকার করে নিন না যে আপনিও জানেন, এরা বাংলাদেশি মুসলমান এবং বেআইনিভাবে চোরাপথে এরা পশ্চিমবঙ্গে পা রেখেছে। অতি সাম্প্রতিক খবর হলো, প্রতি মাসে এ রাজ্যে নাকি ৭০০ কোটি টাকা বিদেশ থেকে চোরাপথে ঢুকছে। চোরাপথটার উৎসভূমি পাকিস্তান। কিন্তু মাঝখানে ফড়ের ভূমিকা নিচ্ছে বাংলাদেশ। এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট-এ জানাশোনা থাকলে খোঁজ নিন— এই পাচারকারী কারা। কারা? মাওবাদীদের পাশাপাশি যাদের হাত ধরে এ রাজ্যে বামফ্রন্টের শাসন ক্ষমতার অন্তিম ক্ষণে প্রধান বিরোধী শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস নন্দীগ্রামে জন-অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল এবং বহু মানুষকে চোরাগোপ্তা শিকার করে দোষ চাপিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের ওপর। এরা কারা? মাওবাদীদের মুখোশ পরে সেদিনের অপরাধীরা আসলে ছিল বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী জিহাদি মুসলমান খুনি, যারা জামাত-ই-মুজাহিদ্দিন বাংলাদেশ, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ, অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট, মৌলানা বদরুদ্দীন আজমল ও জামাত-ই-ইসলমি গোষ্ঠীর সদস্য। এই সব কটি সংগঠনই মূলত

পাকিস্তনপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এবং এরাই এখন বিদেশি অর্থবলে বলীয়ান হয়ে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের মদতদাতা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে 'নিরাপদ আশ্রয়' রূপে ব্যবহার করছে। কারণ, বাংলাদেশের হাসিনা সরকার এদের নেতাদের জেলবন্দি করেছে, ফাঁসিকাঠে চড়িয়েছে। প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর অফিসার আর এস এন সিংহের মতে, এই সব উৎখাত হওয়া সন্ত্রাসবাদীরা নিজভূমে পরবাসী হয়ে একটি রাজনৈতিক দলের মদতে নন্দীগ্রামের মত ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়েছে শুধুমাত্র বামফ্রন্টকে উৎখাত করতে। এখন তাই এরাজ্যে ৪০ হাজার ইমাম বিনা দাবিতেই মাস প্রতি ২৫০০ টাকা করে সরকারি ভাতা পাচ্ছেন। হিন্দু পুরোহিতরা পাচ্ছেন না। কারণ তাঁরা নন্দীগ্রাম ঘটনার কুশীলব ছিলেন না। জেলায় জেলায় ব্লকে ব্লকে গড়ে উঠছে হজ হাউস। তৈরি হয়েছে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী প্রধান আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। গড়ে উঠেছে ৪০০-রও বেশি মাদ্রাসা হস্টেল। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা অকাতরে পাচ্ছে স্কলারশিপ। হিন্দু ছাত্ররা লবডঙ্কা। কারণ তাঁরা পড়াশোনা করে, ভালো ফল করে। তারা ২০১৪ সালের মতো এরাজ্যে ধরা পড়ে না ৪৯৩০টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, ২৭০২০টি গ্রেনেড, ৮৪০টি রকেট লঞ্চার, ৩০০টি রকেট, ২০০০ গ্রেনেড লঞ্চিং টিউব, ৬৩৯২টি ম্যাগাজিন, ১১৪০৫২০টি বুলেট পাচারকারী হিসেবে। স্কলারশিপ বরাদ্দ তাঁদের জন্য যারা সমর্থন করে বাংলাদেশের সবচেয়ে হিংস্র সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী জে বি এলের মতো সংগঠনকে যারা বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রের মধ্যেই আর একটি রাজ্য গড়ে তুলতে পেরেছে। গড়ে তুলতে পেরেছে একটা অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে পাল্টা অর্থনীতি এবং যে গোষ্ঠীর বার্ষিক গড় মুনাফা ২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আপনার নিশ্চয় মনে আছে '৭০-এর দশকের শেষ পাদে একজন মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''ভারত এবং বাংলাদেশের সর্বহারাদের আমি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে পারি না।'' সেদিন তিনি বোঝেননি, ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করছেন নিজের হাতে। আজ নতুন সরকারের আমলেও সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আরও বৃহদাকারে। আজকের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের দরজা হাট করে খুলে দিয়েছেন বাংলাদেশি মুসলমান, রোহিঙ্গা, আফগানিস্তানের মুসলমান, এমনকী আরব রাজ্যের মুসলমানদের জন্যও। হয়তো গোপনে আই এস আই এস-এর সদস্যদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন--- 'এসো, তোমরা আমাকে ভোট দাও, আমি তোমাদের সন্ত্রাসবাদ প্রতিষ্ঠার সব ব্যবস্থা করে দেব।' শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতির জন্য সন্ত্রাসবাদের এহেন তোষণ এ রাজ্যে এর আগে কোনও রাজনৈতিক দলই দেখায়নি। বামফ্রন্ট চাপা তোষণের নীতি নিয়েও পরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল, এ রাজ্যের প্রত্যেকটি মাদ্রাসা সন্ত্রাসবাদী তৈরির কারখানা। বলতে হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের ওপর বসে আছে। কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যে সেকথাও স্বীকার করবেন না, তা শুধু আমি নয়, আপনিও জানেন। আপনি যিনি ধর্মনিরপেক্ষতাকে নিজের বর্ম হিসেবে ব্যবহার করেন না বুঝেই যে ওই বর্মটা আসলে একটা সামান্য আস্তরণ। বুলেট কেন, সন্ত্রাসবাদের কোনও আঘাতকেই আটকানোর ক্ষমতা ওই বর্মটার নেই।

১৯৭০ থেকে ২০১৬--- সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, গোটা ভারতবর্ষে এই ৪৬ বছরে ৯৯৪২টি সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১৮৮৪২ জন। গুরুতর জখম হয়েছেন ২৮৮১৪ জন। প্রতিটি ঘটনার পিছনেই রয়েছে মুসলমান অপরাধী গোষ্ঠী। আর ন্যাশনাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সি বলছে, পশ্চিমবঙ্গ ৪৫০০ মাদ্রাসায় চলছে জেহাদি প্রশিক্ষণ। মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং নদীয়াতে চলছে মুসলমান মহিলা এবং শিশুদের অপরাধী করে তোলার শিক্ষা। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মতো এমন মুক্তাঞ্চল সন্ত্রাসবাদীরা ভু-ভারতে আর পাবে না।

ধর্মনিরপেক্ষতার বর্মধারীদের বলছি, আপনারা মুসলমান মন্ত্রী পেয়েছেন অনেক। এম এল এ, এম পি পেয়েছেন অনেক। মুসলমান মেয়র পেয়েছেন। অচিরেই মুসলমানদের দাবি মতো পেয়ে যাবেন কলকাতা পুলিশের মুসলমান কমিশনার। হয়তো বা চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি পদেও দেখবেন মুসলমানদেরই। বাকিটা আর বাকি থাকে কেন? হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন মুখ্যমন্ত্রীর নিজের হাতে গড়া এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনরাই দাবি তুলবে জেরালো কণ্ঠে--- আমরা চাই মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী। আজকের মুখ্যমন্ত্রী সেদিন কালো বোরখায় মুখ ঢেকেও নিস্তার পাবেন কি? হিন্দু ব্রাহ্মণঘরের মহিলা যদি সেদিন বলেন, 'থাম তোরা। আমি তো মুসলমানই।' মানবেন কি তাঁর মুসলমান ভাইয়েরা?

অতএব হে ধর্মনিরপেক্ষ মহান মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী— একটু বোঝার চেষ্টা করুন, শুধুমাত্র কল্কি অবতার হয়ে থাকার ছলনা দেখতে গিয়ে আপনি শুধু আপনারই নয়, গোটা দেশের কী চরম সর্বনাশ ডেকে আনছেন! একটু বোঝার চেষ্টা করুন, হিন্দুত্ব কোনও ধর্মীয় মতবাদ নয়। হিন্দু মানবজাতির সবচেয়ে শিক্ষিত, সচেতন প্রাচীনতম প্রজাতি। হিন্দুকুশ পর্বতমালা কিংবা সিন্ধুনদের মতোই প্রাচীন একটি ঐতিহ্য। মুসলমানদের মতো একাদেশদর্শী কোনও ধর্মীয় সংগঠন নয়। হিন্দুত্ব একটা মূর্ত আবেগ যা ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক পরম্পরার ধ্বজাবাহী। ওই আবেগের সঙ্গে সম্পর্ক উত্থানের, উন্নতির, স্বাভিমানের। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত। মনে রাখবেন, আপনার ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে সাহায্য করছে ভারতবর্ষকে ফের একটি মৌলবাদী শক্তির উপনিবেশ করে তুলতে। আপনার ধর্মনিরপেক্ষতা সাহায্য করছে কিছু রাজনৈতিক দল এবং নেতা নেত্রীকে যারা আপনাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গোছাচ্ছেন। আপনার ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে ঠেলে দিচ্ছে এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে— নিজভূমে পরবাসী হয়ে থাকার যন্ত্রণার দিকে।

আর নয়। অনেক হয়েছে। এবার খুলে ফেলুন ছদ্ম- ধর্মনিরপেক্ষতার ওই বর্ম। জানবেন, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা রয়েছে হিন্দুত্বের মধ্যেই সর্বংসহা যার পরিচয়। হিন্দুত্বের ভুল ব্যাখ্যা করছেন যাঁরা, তাঁদের মুখোমুখি দাঁড়ান। প্রশ্ন করুন— তুমি নিজে হিন্দু কি? দেখবেন--- ওরা উত্তর দিতে পারবেন না। কারণ ওঁরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, খ্রিস্টানও নয়, বৌদ্ধও নয়, জৈনও নয়, মতুয়াও নয়। ওরা মানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পারিষদবর্গ আসলে ভোটের ভিখারি। ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে এক একটি ভয়ংকর ভ্যাম্পায়ার— রক্তচোষা বাদুড়। ■

কৃষিক্ষেত্রে ঢালাও ঋণ মকুব অর্থনীতির অন্ধগলি

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দি বলয়ের তিনটি রাজ্যে কৃষি ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি দিয়েই নির্বাচনী জয় পেয়েছে কংগ্রেস, এমনটাই দৃঢ় বিশ্বাস কংগ্রেস সভাপতির। তেড়েফুঁড়ে হুংকার দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী কৃষি ঋণ মকুব না করলে তাঁর ঘুম ছুটিয়ে দেবেন। তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম যাঁরা নজর করেছেন তাঁরা জনেন তিনি একাধারে কাণ্ডজ্ঞান ও দায়িত্ববোধহীন। ঋণ মকুবের কী প্রতিক্রিয়া অর্থনীতির ওপর সুদূর প্রসারী ভাবে পড়তে পারে সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত অজ্ঞ। না হলে তিনি জানতেন ভোটে জেতার এই কৌশল তাঁর আবিষ্কৃত বা পেটেন্ট নেওয়া নয়। কংগ্রেস সভাপতি যেমন নিছক গালিগালাজের রাজনীতি করে প্রধানমন্ত্রীকে অপদস্থ করার চেষ্টা করছেন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিপক্ব রাজনীতিবিদ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ তাঁর বাবাকে নির্বাচনে হারিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৯৯০ সালে তিনিই প্রথম ভারতব্যাপী ১০ হাজার কোটি টাকার কৃষিঋণ মকুব করেন। কিন্তু তাঁর এই জনমোহিনী রাজনীতির প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ধ্বংসাত্মক। আজকের মূল্যস্তরে এর পরিমাণ ৫১ হাজার কোটি টাকা। বাস্তবে এই ১০ হাজার কোটির মধ্যে তৎকালীন ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট প্রতিশ্রুত অর্থের মধ্যে মাত্র ২৮০০ কোটি টাকা খয়রাতি খাতে দিয়েছিল। বাকি ৭২০০ কোটির মধ্যে ৫০ শতাংশ হারে রাজ্যগুলির সঙ্গে বাঁটোয়ারা করে নেওয়র কৌশল নেয়। বিশ্বনাথবাবু নানা কৌশল (মণ্ডল কমিশন) করেও রাজত্ব টেকাতে পারেননি। ১৯৯০ সালেই তাঁর পতন হয়।

তবে, তিনি ব্যাঙ্কগুলির অর্থনৈতিক দুরবস্থার সূত্রপাত ও ঋণ খেলাপকে প্রথম বৈধতা দিয়ে যান। ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করতে হবে না এমন একটা ধারণা কৃষকদের মধ্যে দানা পাকাতে থাকায় তারা ধার নিয়ে ব্যাঙ্ককে এড়িয়ে চলতে থাকে। ২০১৫ সালে প্রথম শ্রেণীর সংস্থা আই সি আর আই ই আর-এর সমীক্ষা অনুযায়ী কর্ণাটকের প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটিগুলির ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৮৭-৮৮-তে ৭৫ শতাংশ থেকে ৯১-৯২-এর অর্থবছরে ৪১ শতাংশে নেমে যায়। ব্যাঙ্কিং পরিভাষায় একেই বলে financial indiscipline। এক্ষেত্রে এই বিশৃঙ্খলা তৈরির পথ ক্ষমতালিপ্সু সরকার প্রথম দেখিয়েছিল। সমীক্ষা জানায়, 'debit relef package destroyed the credit culture'। এখানে বলা প্রয়োজন দেশে বন্যা, খরা, ফসলে মড়ক ইত্যাদির ক্ষেত্রে চাষির স্বার্থ দেখতে সরকার দায়বদ্ধ। রাজ্যস্তর বা জেলাস্তরে যেখানে কয়েকটি জেলায় বন্যা বা খরায় চাষি ফসল হারায় সেখানে সরকার ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করেই থাকে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত ঘটনাগুলি স্বতন্ত্র। কিন্তু শুধুমাত্র ভোট কিনতে দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে ডামাডোল করে দেওয়ার এমন প্রচেষ্টা ইউপিএ-১ সরকার ২০০৮ সালেও করেছিল। সেবারও উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল ভাঁওতা। যে সমস্ত চাষি কষ্ট করে দেনা শোধ করেছিল তারা ছাড় পায়নি। যে টাকা ছাড় দেওয়া হয়েছিল তাও সময়ে ব্যাঙ্কে পৌঁছয়নি। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে ব্যাঙ্কে টাকা রোলিং হয়। ঋণ শোধ হয়ে টাকা ফেরত না এলে নতুন ঋণ দেওয়া যায় না। এটি খুবই সহজ কথা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যোগ্য হয়েও বহু চাষি রাজনৈতিক মদতের অভাবে তাঁদের দাবিও জানাতে পারেননি। কৃষি ঋণ একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া, একবার স্বার্থপ্রণোদিত ভাবে এর মকুব চাষিকে দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধি কখনই এনে দিতে পারে না।

এবারের কৃষিতে যে বিপর্যয় হয়েছে তার মধ্যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের মতো কয়েকটি রাজ্যে ছিল খরার প্রকোপ। কৃষকের দুঃখ,

বিক্রি করার বিষয়টা এমনি খুব মনকাড়া হলেও দেশে একটি অর্থনৈতিক বিধি বিধানের মধ্যে অর্থনীতির আবর্তন ঘটে। কর্ণাটকে ৩৪ হাজার কোটি টাকা ১০ দিনের মধ্যে মকুবের ঘোষণা হলেও সেখানকার বিজেপির তরফ থেকে পরিস্থিতি জরিপ করে জানানো হয়েছে যে ২১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬ মাস কেটে গেছে। ইতিমধ্যে ৩৭৭ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী কুমারস্বামী ৪৩ লক্ষ চাষির ঋণ মকুব ঘোষণা করলেও এ পর্যন্ত মাত্র ২৭ হাজার চাষি ঋণমুক্ত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তৃতাতেও এ তথ্য উল্লেখিত। প্রতিশ্রুতির এই ছলনা বহমান।

অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশে ৩১ মার্চ ২০১৮-কে effictive date ধরে ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ ও বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ খোলা ক্যামেরায় বলেছেন যে এত বড়ো ভণ্ডামি আর হয় না। স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণের পূর্বে বলা যে চক্রাকার আবর্তন হয় তাতে মধ্যপ্রদেশে উল্লেখিত তারিখে সব ঋণই সাধারণত শোধ হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কার ঋণ মকুব হবে?

এটা নিশ্চিত কৃষিক্ষেত্রে যা দরকার সেই সংস্কারের সদর্থক চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকার শুরু করলেও বহু ক্ষেত্রেই তা চাষির কাছে পৌঁছয়নি যেমন—

(১) প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা যা ঠিক সময়ে করাতে পারলে অতি সহজেই খরাজনিত ক্ষতি এড়ানো যেত। এক্ষেত্রে বিমা সংস্থাগুলি তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। একই সঙ্গে বিমার মাশুলও বেশি ছিল বলে খবর।

(২) ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া-তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না রেখে সরকার নিযুক্ত এ সংক্রান্ত প্যানেলের মত অনুযায়ী সরকারি ভরতুকির টাকা সরাসরি চাষির ব্যাঙ্কের খাতায় যাক।

(৩) কেন্দ্র ৪০ হাজার কোটি টাকার দীর্ঘমেয়াদি Irrigation Fund যা NABARD-এর অধীনে কাজ করছে তার সার্বিক সুবিধে ২০১৯-এর ডিসেম্বরের আগে জমিতে সঠিকভাবে পৌঁছবে না। এক্ষেত্রে কিন্তু রজ্যগুলির তরফেও ঢিলেমি ও আমলাতান্ত্রিকতার দায় রয়েছে।

(৪) নীতি আয়োগের দলিল অনুযায়ী কৃষি ক্ষেত্রের উন্নয়নের সমান্তরাল ভাবে বিপণনে উপযুক্ত নজর দেওয়া হয়নি। মান্ধাতার আমলে কিছু আইন Agriculture Produce Marketing Act-এ সংশোধন ও রাজ্যের অংশগ্রহণ সঙ্গতিপূর্ণ হলেই মার্কেটিংয়ের সাফল্য আসবে। চাষির দাম পেতেও সুবিধে হবে।

(৫) আরও একটি বিসদৃশ ব্যাপার দেখা গেছে। পর্যাপ্ত উৎপাদন হওয় সত্ত্বেও অনাবশ্যক আমদানি-পণ্য বাজারে ঢুকেছে। এক্ষেত্রে সরকার নিরোধক ব্যবস্থা যথাসময়ে নেয়নি। ফলে দামের ক্ষেত্রে চাষি মুখ থুবড়ে পড়েছে।

(৬) পর্যাপ্ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ কেন্দ্রের অভাবে উৎপাদিত শস্য নষ্ট হয়েছে। এটি দীর্ঘদিনের সমস্যা এবং শুধু কেন্দ্রের ওপর এটি ছেড়ে দিলে রাজ্য সরকারগুলি দায়িত্ব এড়াতে পারবে না।

এই ধরনের আরও কিছু সমাধানযোগ্য সমস্যা রয়েছে। সেগুলির দিকে সরকার নজর না দিলে বিপদ। কেননা এটি প্রকৃতিনির্ভর ও সালিয়ানা সমস্যা। তাই অপরিণামদর্শী এক ক্ষমতালিপ্সুর হঠকারী সিদ্ধান্তের অনুসারী হয়ে কয়েকটি বিজেপি শাসিত রাজ্য এর মধ্যে বিশল্যকরণী খুঁজে পেলেও ভারতীয় অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ। (১) অরবিন্দ পানাগাড়িয়া বলছেন, 'A sad race to the bottom has begun.' (অন্ধগলির দিকে ছোটার প্রতিযোগিতা চলছে), (২) উর্জিত প্যাটেল বলেছেন— 'A farm loan waiver undermines an honest credit culture.' (৩) আর সবচেয়ে আদরের পূর্বতন আর বি আই গভর্নর কেমব্রিজের অর্থশাস্ত্রী রঘুরামরাজন নির্বাচন কমিশনকে প্রমাদ গনে চিঠি দিয়েছেন। তাঁরা যেন নির্বাচনের আগে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করে। রাহুলবাবুর এতসব বোঝার দায় নেই। ▌

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

ধর্মীয় জনবিন্যাসে দ্রুত পরিবর্তন আনার একটি মাধ্যম লাভ্ জিহাদ

মাধবী মুখার্জী

বিগত এক দশকে ইসলাম এবং জিহাদ পৃথিবীর সর্বাধিক চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে। ইসলামি জিহাদের আধুনিকতম কৌশল হলো লাভ্ জিহাদ, ধর্ম জিহাদ, কর্ম জিহাদ, পরকালের লোভে জিহাদ, অর্থ- সম্পত্তির লোভে জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্যের জিহাদ, জমি জিহাদ, রাজনৈতিক জিহাদ, সমাজে বা দেশ-বিদেশে মান-সম্মান বাড়ানোর লোভে জিহাদ, সর্বোপরি জান্নাতের লোভে জিহাদ।

অন্যান্য জেহাদি কৌশলের চেয়ে বর্তমান সমাজপ্রেক্ষিতে অনেক বেশি সহজ এবং নিরাপদ হলো 'লাভ্ জিহাদ'। সচেতন হিন্দুরা লাভ জিহাদের অস্তিত্ব জেনে সোচ্চার হয়েছে দিনের পর দিন। অপরদিকে তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবী ও মুসলমানরা প্রাণপণে জিহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে যাচ্ছে। তাদের মতে সবই হিন্দুত্ববাদীদের অপপ্রচার। শুধু হিন্দুত্ববাদীরা নয়, অন্যান্য ধর্মের মানুষেরাও এর দ্বারা আক্রান্ত। সে কথা অতি সচেতনতার সঙ্গে এড়িয়ে চলেছে দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা। তাদের মতে লাভ জিহাদ অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন।

'লাভ জিহাদ'— এই সুচতুর পরিকল্পনাটি পাকিস্তানের মাটিতে লস্কর-ই-তৈবা' নামক বিশ্বত্রাস সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের গবেষণা প্রসূত। 'লাভ' এবং জিহাদ শব্দ দুটি পৃথক পৃথক ভাবে সকলে শুনলেও একসাথে জোড়কলম শব্দ হিসেবে অধিকাংশ মানুষই তা শোনেননি। 'লাভ'-এর অর্থ হলো প্রেম বা ভালোবাসা আর জিহাদের অর্থ ধর্মযুদ্ধ। সুতরাং এই জোড়কলম শব্দের অর্থ দাঁড়ায় প্রেম বা ভালোবাসার জন্য যুদ্ধ। এই স্ববিরোধী শব্দের মাধ্যমে অন্য ধর্মের মেয়েকে ফুসলিয়ে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করাই হলো লাভ জিহাদের মূল উদ্দেশ্য।

যখন সারা দেশ জুড়ে চলছে লাভ জিহাদের মতো ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ঠিক তখনই হাদিয়া ইস্যুতে মামলাগুলি সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। লাভ জিহাদ সংক্রান্ত একটি মামলার তদন্ত শুরু করে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আই এ)। হিন্দু মেয়েকে বলপূর্বক বিবাহের অভিযোগের ভিত্তিতে মহামান্য আদালত সেই মামলার রায় অনুযায়ী মেয়েটিকে তার পিতার কাছে ফেরত পাঠাতে নির্দেশ দেয় এবং ওই মামলাকে লাভ জিহাদের তকমা দেওয়া হয়। হিন্দু মেয়েদের লাভ জিহাদের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না মহামান্য আদালত সেটিরও তদন্ত করে দেখার নির্দেশ দেন। মহামান্য আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ওই ধর্মান্তরিত বিবাহ অবৈধ। কারণ, তা করা হয়েছে লাভ জিহাদের মাধ্যমে।

সম্প্রতি পুলিশের একটি বিশেষ শাখার তদন্তে জানা গেছে, গত ছ'মাসে সাত হাজারের ওপর হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ মেয়েদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে লাভ জিহাদের মাধ্যমে।

'লাভ জিহাদ' নামে একটি সংস্থা এই কাজের জন্য সুদর্শন মুসলমান যুবকদের নিয়োগ করে থাকে এবং তাদের ফ্যাশনেবল পোশাক- পরিচ্ছদ, মোটরবাইক, মোবাইল ফোন এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। নিয়োগকৃতদের নির্দেশ দেওয়া হয় অন্য ধর্মের কোনও মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে ধর্মন্তরিত করে বিয়ে করতে এবং বিশেষ নির্দেশও জারি করা হয় যেন তাদের গর্ভে অন্তত চারটি সন্তানের জন্ম দেওয়া হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জিহাদিদের লক্ষ্য হলো স্কুল ও কলেজের হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ শিখ প্রভৃতি মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা।

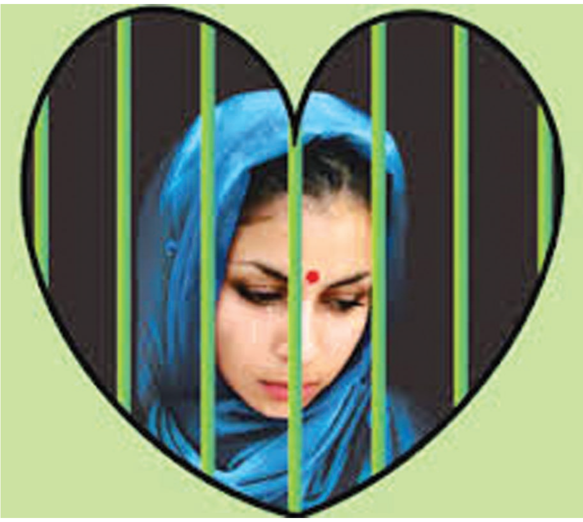

'লাভ জিহাদে'র পরিকল্পনাটি সফল করা হয় ভালোবাসা বা প্রেমের অভিনয়ের ছদ্মবেশে। অর্থাৎ প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে ছলে- বলে-কৌশলে মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে হিন্দু অথবা অ-মুসলিম মেয়েদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করা এবং তাদের ঔরসজাত সন্তান দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং হিন্দুধর্মকে তুচ্ছ, মিথ্যা এবং কাফেরের ধর্ম প্রমাণ করে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। লাভ জিহাদের মূল লক্ষ্য হলো কোনও অ-মুসলমান দেশে ধর্মীয় জনবিন্যাসে দ্রুত পরিবর্তন আনা আর একাধিপত্য স্থাপন করা।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে বন্ধুত্বের ফাঁদ পেতে রেখেছে জিহাদিরা। তাদের নিশানায় রয়েছে সতেরো থেকে

সাতাশ বছরের যুবতীরা। এর নেপথ্যে লুকিয়ে আছে লাভ জিহাদের মতো সুগভীর-কৌশলী ষড়যন্ত্র যা জানলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়।

ফেসবুকে একটা 'হাই' বা হোয়াটস্‌অ্যাপে 'হ্যালো' সাধারণ দৃষ্টিতে খুবই তুচ্ছ, সাধারণ বিষয়। তাই মেয়েরা নিজেও বুঝতে পরে না যে সে 'শিকার' হতে যাচ্ছে। সেই ছদ্মবেশী জিহাদি শিকারি ছলে-বলে- কৌশলে সাইকোলজিক্যাল ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে প্রেম এবং যৌনতার মিশ্রণ ঘটিয়ে এতটাই দায়িত্বশীল ও যত্নশীলতার প্রদর্শন করে যে হিন্দু মেয়েরা চুম্বকের মতো আকর্ষিত হতে বাধ্য হয়। মেয়েদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলে কিছুদিন দায়িত্বশীল প্রেমিকের অভিনয় করে যায় এবং যৌনতার অনাস্বাদিত স্বাদ দেওয়ার পর ইসলামে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করে সন্তান উৎপাদন করে। তারপর আবার একটি মেয়ের পিছনে পড়ে। এভাবে চলতে থাকে ধারাবাহিক ধর্মান্তরকরণের পরিকল্পনা মতো কাজ।

মুসলিম ব্যক্তিগত আইন অর্থাৎ শারিয়তি বিধানের ভিত্তিতে কোরান এবং হাদিশ মতে একসঙ্গে চারটি বিয়ের সম্মতি থাকায় গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার পর অপর শিকারের জন্য ফাঁদ পাতা হয়। কারণ শরিয়তি বিধানে একসঙ্গে বহুবিবাহ স্বীকৃত। সুতরাং কোনও আইনি বাধা নেই। তাছাড়া তালাক দিতেও কোনও অসুবিধে নেই। প্রতিটি ধর্মান্তরকরণের জন্য দুই থেকে সাত লাখ টাকা পর্যন্ত ইনাম দেওয়া হয় জিহাদিকে। একবার এই ফাঁদে পা দিলে আর রক্ষে নেই। বেরিয়ে আসার সব পথ বন্ধ। শুধু তাই নয়, বিয়ের পর ওই যুবতীদের ইসলামিক দেশে আই এসের যৌনদাসী হিসেবেও পাচার করা হয়।

সম্প্রতি জি নিউজ-সহ কয়েকটা গণমাধ্যমে খবর বের হয়, আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন্ দাউদ ইব্রাহিম ও সমগোত্রীয় ইসলামিক ডনরা লাভ জেহাদে বহু কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। এন আই এ এবং দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ডনরা ভারতে বিনোদন জগতে মোটা অঙ্কের পুঁজি বিনিয়োগ করে সিনেমা, টিভি সিরিয়াল, নাটকের প্রযোজনা করছে। এবং সেই সব সিনেমা, নাটক, সিরিয়ালগুলোর গল্পের কেন্দ্রে থাকে অন্য ধর্মের মেয়েদের সঙ্গে মুসলমান ছেলেদের প্রেম, বিবাহ এবং সংসারে উত্তরণ। সে সব গল্পের সারাংশ হলো শিক্ষা ও সভ্যতার অবনতি অপসংস্কৃতির ধারক, যা লাভ জিহাদকে আরও প্রভাবিত এবং প্ররোচিত করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

লাভ জিহাদে আক্রান্ত মেয়েদের পরিণতি সাধারণ আর পাঁচটা মুসলমান মেয়েদের মতো নিরাপত্তাহীন হয়ে পতির ক্রীতদাস হয়ে অন্য স্ত্রী বা স্ত্রীদের সঙ্গে চুলোচুলি করে এবং অনেক সতীনের মাঝে কষ্ট বুকে চেপে রেখে নারকীয় নির্যাতন সহ্য করে হাসি মুখে জীবন কাটাতে হয়। অথবা তাদের সন্ত্রাসবাদের কাজেও লাগানো হয়। আর যদি তালাকপ্রাপ্তা হয় তবে পতিগৃহে তার আর স্থান হয় না এবং নিজগৃহে ফিরে আসাও দুষ্কর। ফলে, অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে অতি নিম্নবৃত্তির কাজ কিংবা দেবব্যবসার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাসহ শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, সিকিম, গ্যাংকট, দার্জিলিং অঞ্চলে এমন অনেক দেবব্যবসায়ী দেখা যায় যারা লাভ জিহাদে আক্রান্ত, ভুক্তভোগী। অনেকক্ষেত্রে আবার তাদের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দেশ-বিদেশে দেহ ব্যবসার কাজের জন্য পাচার করে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের পাল্লায় পড়ে নিখোঁজ অথবা মৃত্যুবরণ করতে হয় তাদের। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদেই স্বামী পরিত্যক্তার সংখ্যা দুই লক্ষের বেশি।

তাহলে সমাধান কী? বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মান্তরকরণের কারণে সমাজ ও দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন পর্যন্ত নিরুপায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ধর্ম-সংস্কৃতির চেতনার অভাবে মেয়েরা লাভ জিহাদের শিকার হচ্ছে। লাভ জিহাদের শিকার হওয়া মেয়েদের বাঁচানো বা উদ্ধার করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সুতরাং জিহাদি অপরাধগুলোকে অঙ্কুরে বিনাশ করা না গেলে পরবর্তীতে ক্যান্সারের মতো রোগ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়বে যার চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এমন সুপরিকল্পিত ভাবে ধর্মান্তরকরণ চলতে দেওয়া উচিত নয়। দ্রুত সমাধান করতে হলে একটাই উপায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিফিল কোড চালু করা। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি শুরু হলে সমস্যা এমনিতেই অনেকটা কমে যাবে। মুসলমান মেয়েদের তালাক এবং মিঞার নতুন বিবি ঘরে আনার ভয় থাকলে তারা প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পাবে। অন্যদিকে আজীবন হাজতবাস যে মৃত্যুর চাইতে অনেক বেশি কষ্টকর সেটা মুসলমানরা খুব ভালো করেই জানে। সুতরাং তারাও একটা বিয়েতে সন্তুষ্ট থাকতেই বাধ্য হবে। ফলে জেহাদি কার্যকলাপকে শেষ করে দিতে পারা যাবে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিফিল কোডের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব।

তুরস্ক মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র। ১৯২৬ সালে তুর্কি সিভিল কোড প্রণয়ন করে আনুষ্ঠানিক ভাবে বহুবিবাহকে অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। মারিশাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তিউনিসিয়া, এমনকী অন্যতম ইসলামিক রাষ্ট্র আরব, সেখানেও ১৯৫৬ সালে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। তাহলে ভারতে মুসলমানদের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ বৈধ হবে কেন? একজন অমুসলিম মেয়ে মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করলে বা ইসলাম মতে ধর্মান্তরিত হলে তার যে ধরনের সামাজিক এবং আইনগত সমস্যা তৈরি হয় সেই সম্পর্কে সমাজ রাজ্য, দেশ এত উদসীনই-বা থাকবে কেন?

দেশের ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসকে লাভ জিহাদের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ভাবে পালটে ফেলা হচ্ছে যা অদূর ভবিষ্যতে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিপদের রূপ নিতে চলেছে। সুতরাং প্রতিটি সুস্থ, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ, দেশপ্রেমী ভারতবাসীর এই মুহূর্তের জরুরি কাজগুলির অন্যতম কর্তব্য হলো এই বিপদ সম্পর্কে সবাইকে বিশেষকরে স্কুল-কলেজের মেয়েদের সচেতন করা এবং এই গুরুতর সমস্যার বাস্তব সমাধানের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করার পক্ষে দেশব্যাপী ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা। ■

মায়েদের পারম্পরিক রান্নায় যত্নবান হওয়া উচিত

সুতপা বসাক ভড়

জীবনধারণের জন্য খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আমরা কী ধরনের খাবার খাচ্ছি, তার ওপর নির্ভর করছে আমাদের জীবনশৈলী। সেজন্য, প্রতিদিনের নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন হওয়া প্রয়োজন। একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, গত কয়েক দশকের মধ্যে ভারতের সাধারণ মানুষের খাদ্যাভ্যাসে বিশাল পরিবর্তন ঘটেছে। আজকের নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি পরিবারের পছন্দের স্বাদেও পরিবর্তন এসেছে। দূরদর্শন, খবরের কাগজ, ইন্টারনেটে বিদেশি খাবারের চটকদারি বিজ্ঞাপনে আকর্ষিত হয়ে আমরা অনেকটাই ওইদিকে ঝুঁকেছি। ফলে, আজ

আমাদের দেশের মানুষ অপুষ্টি, মোটা হওয়া, অ্যানিমিয়া, ডায়াবিটিসের মতো আপাতনিরীহ রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার শিকার হয়ে পড়েছে। শরীর যদি সুস্থ এবং নীরোগ না হয়, তবে জীবনের সব আনন্দই বৃথা হয়ে যায়। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার। ঈশ্বরের দেওয়া আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে সুচারুভাবে চালানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন খনিজ, প্রোটিন এবং ভিটামিন প্রয়োজন। সেজন্যই শরীরের সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য সুষম খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। দেশে অপুষ্টির একটি অন্যতম কারণ হলো পরিবর্তিত এবং ব্যস্ত জীবনযাত্রা। চারপাশে একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব যে, পরম্পরাগত ভারতীয় খাবারের জায়গা কীভাবে 'রেডি-টু ইট' খাবারগুলি দখল করে চলেছে। কারণ আজকাল অনেক মহিলা রান্না করার সময় পান না। ফলস্বরূপ, খাবারের পুষ্টিগত মূল্য কম হয়ে চলেছে। পুষ্টি এবং আহার বিশেষজ্ঞদের মতে ফ্রোজেন বা রেডি-টু-ইট' খাবারগুলি একদিকে আমাদের সময় বাঁচায় এবং পেট ভরিয়ে দেয়, অপরদিকে এগুলি আমাদের ভয়ংকর বিপদের দিকে ঠেলে দেয়। সেজন্য, পরিবারের সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে মায়েদের একটু কষ্ট করে দৈনন্দিন জীবনে পারম্পরিক রান্নায় যত্নবান হতে হবে।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১৪০টি দেশের মধ্যে ভারতের অপুষ্টিজনিত বাচ্চার সংখ্যা সর্বাধিক। মোটা হওয়ার ব্যাপারে আমরা তৃতীয় স্থানে এবং মধুমেহর মতো অসুখে আমরা শীর্ষস্থানে আছি। এই তিনটি অসুখের মূল কারণ হলো পুষ্টিকর খাবার না খাওয়া। দেশে পাঁচ থেকে কম বয়সী সব বাচ্চাদের ওজন তাদের নিজেদের প্রকৃত ওজনের থেকে ৩৫.৭ শতাংশ কম। ২১ শতাংশ বাচ্চাদের ওজন তাদের উচ্চতার অনুপাতে কম। আয়ুর অনুপাতে কম উচ্চতাসম্পন্ন বিশ্বের প্রতি দশটি বাচ্চার মধ্যে তিনটি ভারতীয়।

এছাড়া, দেশের ৩৩.৬ শতাংশ মহিলা ভীষণভাবে অপুষ্টি এবং ৫৫ শতাংশ রক্তাল্পতার শিকার। খাদ্যে লোহার পরিমাণ কম হলে রক্তাল্পতায় আক্রান্ত হতে পারে। এইসব মহিলা যখন কম বয়সে মা হন, তখন ওই সদ্যোজাত শিশুদের জীবন সংকটের সম্ভাবনা থেকে যায়।

দেখা গেছে যে, দেশের ৯০ শতাংশ বাচ্চা সুষম ও পুষ্টিকর খাবার পায় না। ফলে এদের ঠিকমতো শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হয় না। ধনী পরিবারে জন্মানো বাচ্চাদের তুলনায় গরিব পরিবারে জন্মানো বাচ্চা অপুষ্টির শিকার হবার সম্ভাবনা ২.৮ শতাংশ বেশি হয়। ওইসব বাচ্চার অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসায় অনেক টাকা খরচ হয়, সেজন্য পুষ্টিকর খাবার কেনার জন্য তারা প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারে না। ছোটোবেলায় পুষ্টিকর খাবার না খেলে তা ভবিষ্যতে হৃদরোগ, ডায়াবিটিস, মোটা হওয়া, হাইপার টেনশানের মতো গুরুতর অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এইসব অসুখের চিকিৎসার মোটা খরচ পরিবার এবং দেশের অর্থব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ থেকেই অনুমান করা যায়, আমাদের দেশের পারম্পরিক খাদ্যকে অবহেলা আমরা কীরম বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি। এই ভুল সংশোধনের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে মহিলাদের হাতে। তাঁরা যদি পারম্পরিক খাবারগুলি নিয়মিতভাবে বাড়িতে রান্না ও খাওয়ার ব্যাপারে সচেতন হন, তাহলে আমাদের পরিবার, সমাজ ও দেশ একটি নয়, অনেকগুলি সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে। সেজন্য সময় হয়েছে পারম্পরিক খাবারে ফিরে যাওয়া। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে আজ যে আমরা এত বিচলিত তার একটি কারণ হলো— আমরা ঘরোয়া খাবার, ডাল তরকারি শাকসবজিকে আবর্জনা মনে করছি। অথচ নিউইয়র্কে ওজন কম করার জন্য হলুদের ব্যাপক ব্যবহার করা হচ্ছে। সানফ্রানসিসকোতে পাঁচতারা হোটেলে ফ্রেঞ্চ টোস্টে মেপল সিরাপের স্থানে ঘি লাগানো হচ্ছে। সুতরাং, এবার আমাদের সচেতন হতে হবে। এই গুরুদায়িত্ব বাড়ির মহিলাদের, কারণ তাঁরাই পারেন পরিবারের সকলের থালাতে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করতে। ▌

সর্বরোগ প্রতিরোধকারী হলুদ

অসিতবরণ আইচ

● হলুদের কত গুণ সেসব জানা এবং জানানো কারো পক্ষেও সম্ভব নয়।

● বিধাতার এক অপরূপ সৃষ্টি এই হলুদ প্রায় সর্বরোগেই কল্যাণকর এবং সর্বরোগ প্রতিরোধকারী।

● হলুদের 'কারকিউমিন' নামক পদার্থটি সর্বরোগহর। মানুষের ইমিউনিটি বাড়িয়ে দেয়।

● ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগ প্রতিরোধে কাঁচা হলুদের ও গুঁড়ো হলুদের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

● হলুদ খাদ্য হিসেবে ও বাহ্যিক প্রয়োগেও কল্যাণকর।

● কেটে গেছে হলুদ গুঁড়ো চেপে ধরলে রক্তপড়া বন্ধ হবে, সুন্দর জোড়া লেগে যাবে।

● পুড়ে গেলে, ঝলসে গেলে হলুদবাটা লাগানো মহোপকার।

● জোঁকে ধরলেও হলুদ লাগানো যায়।

● মচকে গেলে চুন-হলুদ গরম করে লাগালে বেশ উপকার হয়। ব্যথা ও ফোলা দুই-ই কমায়।

● হলুদ গরম জলে ফুটিয়ে গারগেল করলে মুখের ভিতরে ও জিভের সবরকম ঘায়ে উপকার হবে এবং টনসিলের সমস্যা দূর হয়।

● কাঁচা হলুদ আর নিমপাতা বাটা গায়ে-মুখে মেখে আধঘণ্টা পর ধুয়ে ফেলে গামছা বা তোয়ালে দিয়ে রগড়ে দিতে হবে। চামড়ার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চর্মরোগও প্রতিরোধ করে।

● গরম দুধে হলুদ চূর্ণ মিশিয়ে খেলে দুধের পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধি পায়। নানা রোগ প্রতিরোধ করে।

● পাকস্থলীতে ঘা হলে দুধ-হলুদ বা হলুদ-জল খুবই উপকারী।

● গরমভাতে ভালো হলুদবাটা বা গুঁড়ো খুবই উপকারী।

● গোলমরিচের সঙ্গে হলুদ ফোটানো জল খেলে সর্দিকাশি কমে।

● কাঁচা হলুদের রস ব্লাড-ক্যানসারে ফলদায়ক।

● এছাড়া স্তনের, অন্ত্রের ও অগ্নাশয়ের ক্যান্সারেও হলুদ উপকারী।

● শিশুদের নিউকেমিয়ার ঝুঁকি কমায় হলুদ।

● রক্তের ঘনত্ব কমিয়ে হার্ট ব্লকেজ থেকে বাঁচায় হলুদের রস।

● হলুদ বাড়তি মেদ কমায়।

● রুটি লুচি পরোটা এমনকী পায়েশেও হলুদ খাওয়ার অভ্যেস করতে হবে।

● যে কোনো ঘায়ে গোমূত্রের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে লাগালে খুব ভালো কাজ হয়।

● হলুদের রস ডায়াবেটিসে লাভদায়ক। ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ করে।

● কোষ্ঠকাঠিন্যেও হলুদের রস লাভদায়ক।

● ঋতুচলাকালীন অতিরিক্ত রক্তস্রাবে হলুদ উপকারী।

● জন্ডিসে বা রক্তাল্পতায় গায়ের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেলে, কাঁচা হলুদের রস লাগাতে হবে।

● হলুদ দিয়ে ফুলকপি— ক্যান্সারের পথ্য।

● মুসুরডাল বাটা ও কাঁচা হলুদবাটার মিশ্রণ মুখের ত্বকের লাবণ্য বৃদ্ধিতে খুবই লাভদায়ক।

● সকালে ঘুম থেকে উঠে কাঁচা হলুদ, গুড় বা মধুর সঙ্গে খেলে বহু রোগে কল্যাণকর।

● মুখের ব্রণ দূর করতে হলুদবাটা খুবই কার্যকরী।

● দাঁতের ক্ষয়ে বা ঘায়ে হলুদ সরষের তেলের সঙ্গে পেস্ট করে নুনসহ লাগালে ব্যথা উপশম হয়।

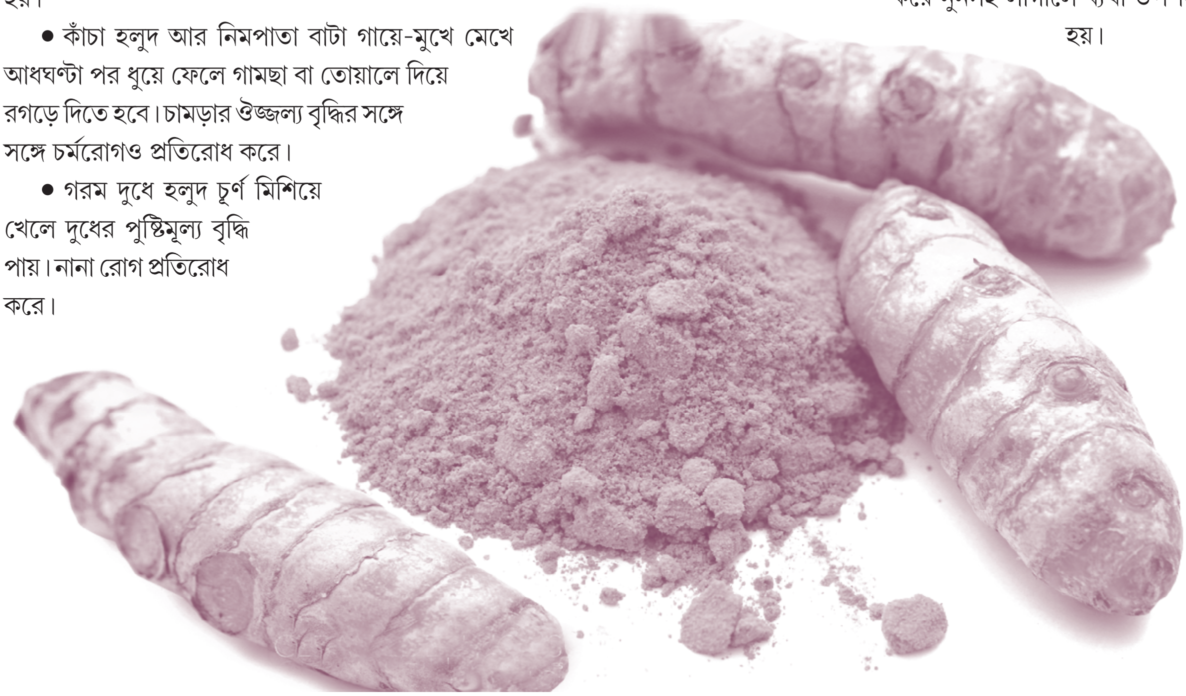

চিঠিপত্র

ঘরশত্রুরা দেশ ভাঙার খেলায় মেতে উঠেছে

২০১৯-এর নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে একটা শ্রেণী ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম উঠে পড়ে লেগেছে। তারা রব তুলেছে যে দেশটার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না, সব ধ্বংস হওয়ার পথে। ২000 সালে বাজপেয়ীজীর সময়ে পেঁয়াজের দাম হয়েছিল ৫০ টাকা কেজি। তখনও রব উঠেছিল দেশ এই পেঁয়াজের জন্যই সরকারের পতন ঘটতে শুরু করেছে। ওই সময় একটা রব উঠেছিল দু'টা শার্ট কিনলে এক কেজি পেঁয়াজ ফ্রি। এবারও শুরু হয়েছে সেই কীর্তন। এ সরকার দেশের সর্বনাশ করছে। এ সরকার জনগণের জন্য মোটেই শুভদায়ক নয় ইত্যাদি। তাই এরা কনৌজের জয়চাঁদ সেজেছে। ঠিক যেন আজমির এবং দিল্লির পৃথ্বীরাজকে উৎখাত করার মতো। সেই ভাবনা এদের জেঁকে বসেছে। তাই এরা বিদেশি শত্রুকেও আহ্বান জানাচ্ছে। দেশের স্বার্থ এরা মোটেই ভাবছে না।

ঘরশত্রুরা মহম্মদ ঘুরিকে ডেকে এনেছিল। প্রথমে পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘুরিকে পরাজিত করে ক্ষমাও করে দিয়েছিলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হয়েছিলেন। তখন পৃথ্বীরাজকে মেরে ফেলে উলটো পিঠে বেঁধে আফগানিস্তানে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হয়েছিল। এরপরই শুরু হয় ভারতবর্ষের পরাধীনতার যুগ। তেমনি ১২০১ খ্রিস্টাব্দে বক্তিয়ার খলজি বাংলার রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করে। যেখানে রাজত্ব করতেন বাংলার শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন। যিনি শিকার হয়েছিলেন তার নিজস্ব কিছু লোকের দ্বারা। যাতে করে মধ্যাহ্ন ভোজন বন্ধ রেখে রাজপুরীর পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে পূর্ববঙ্গে পালাতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। ঘরের শত্রুর জন্য প্রতারিত হয়েছিল বাংলা এবং ভারতবর্ষের হিন্দুরা। জানি না এখনকার জয়চাঁদরা আর কতদিন ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

—**স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর, নদীয়া।

গান্ধীজীর অহিংস তত্ত্ব

স্বাধীনতার সত্তর বছর পার করে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদের সাধনায় মত্ত। আমরা ভুল করেও আমাদের 'জাতীয়ধর্ম' কী হতে পারে তা নিয়ে কখনও চর্চা করি না। দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ, ভারত ভাগ করা হয়েছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে, এক কথায় হিন্দু ও মুসলমানে। এর মূলে আছে ধর্ম। ভারত ভাগের পর ভারত থেকে চলে যাওয়া আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোমারাদুদ্দিন মোক্ষম একটা কথা লিখে গেছেন তৎকালীন লাহোরের 'লাইট' নামে এক পত্রিকায়— ''হিন্দু ভারতে আমাদের রেখে আসা পাঁচ কোটি মুসলমানকে থাকতে বলা হলো তাদের আর একটা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার জন্য। এর অর্থ এই নয় যে আমরা পাকিস্তানকে হিন্দুস্তান আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাবো এবং তাদের সাহায্য করবো। আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে পাকিস্তানের উপস্থিতিতেই তারা হিন্দুস্তানের হিন্দুদের উপর একটা বড়ো ধরনের নৈতিক চাপ সৃষ্টি করবে, আমাদের সঙ্গে ভালোভাবে রফা করতে সাহায্য করবে। এখন আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি আমরা অর্ধেকটা জয় করে ফেলেছি বাকিটা জয় করার জন্য আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে, সংগঠিত করতে হবে এবং আবার লড়াই করতে হবে।'' এসব কথা লেখা হয়েছে ভারত ভাগের গোড়ার পর্বে। তখন আমাদের নেতৃবৃন্দ কী করছিলেন? আর একটা উদাহরণ— ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতার প্রাককালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী কলকাতার বেলেঘাটায় একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে অবস্থানকালে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তাঁর 'সাতচল্লিশের ডায়েরি'র পাতায় লিখে গেছেন গান্ধীজীর অনবদ্য এক স্বভাবসিদ্ধ ভূমিকার কথা— ''ছাত্রদের এক সভায় ছাত্ররা বললো এখানে দাঙ্গায় তারা অংশগ্রহণ করেনি, আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু করেছে। উত্তরে গান্ধীজী অহিংস বিষয়ে এক ভালো বক্তৃতা দিলেন, প্রতিশোধ বা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র গ্রহণ করলে হিংসা করা হয়। অপরকে পরাস্ত করতে হলে বেশি হিংসা প্রয়োগের দরকার হয়। এর শেষ নেই। আত্মরক্ষার অধিকার অহিংসা। সৈনিককে সহিংসার পথ বর্জন করতে হবে। বহুমানব কীভাবে এই সাহসে সাহসী হয় জানি না, সেই সাধনাই আমি করছি।'' এরপর গান্ধীজী পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের যুদ্ধের কথাও বলেন, দুই রাষ্ট্র স্বীকার করে এবং দুই রাষ্ট্রের মানুষ হিন্দু ও মুসলমান না হয়ে নাগরিক হিসাবে যখন থাকতে স্বীকার তখন Two-Nation Theory-কে এক দিক থেকে নষ্টই করে দেওয়া হয়েছে।' আমি এখানে অলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন এক অধ্যাপক কোমারাদুদ্দিনের লেখার সঙ্গে গান্ধীজীর ভাষার তুলনা টেনেছি এই কারণে চিন্তা দর্শনে কে কতটা বাস্তবোচিত ছিলেন এবং আজ তার কতটা আমরা মূল্যায়ন করেছি। অধ্যাপক আদুদ্দিনের কথায় ভারতভাগের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর হিন্দুস্থানে পাঁচ কোটি মুসলমান থেকে গেল 'হাসকে লিয়ে পাকিস্তান', পরবর্তীতে 'লোড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থানের' জন্য আর গান্ধীজীর ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে 'Two-Nation Theory' আর একবার সফল প্রয়োগের প্রস্তুতি চলছে যেসব হিন্দু পাকিস্তানে রাষ্ট্রে রয়ে গেল তারা কংগ্রেস নেতৃত্বের ভুলের মাশুল গুনছে, তাদের ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা একবারও ভেবে না দেখে ভারতের অভ্যন্তরে পাকিস্তান সৃষ্ট সন্ত্রাসী জঙ্গি হামলায় ক্ষতবিক্ষত হয়েও আমাদের জাতির জনকের 'ছাপমারা অহিংস' তত্ত্ব দেশবাসীর নিকট সমানে প্রচার করে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেশটার কী পরিণতি দাঁড়াবে সময় বলবে।

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

সংবাদপত্রে আশাভঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু বাঙ্গালিদের একাংশ কি খবরের কাগজ পাঠে বিমুখ হয়ে পড়ছে? আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই ব্যাপারটা খোলসা করছি। আমি কোনওকালেই

আনন্দবাজার পত্রিকার পাঠক নই। ছোটোবয়সে বাড়িতে 'যুগান্তর' আসত। পরে কিছুদিনের জন্য 'আজকাল'। তারপর দীর্ঘকাল ধরে 'বর্তমান'। বরুণ সেনগুপ্তের বলিষ্ঠ সম্পাদনায় প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল কাগজটি। পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দু বাঙ্গালিদের আশা আকাঙ্ক্ষার সঠিক প্রতিফলন ঘটাতে কার্পণ্য করতেন না বরুণবাবু। পত্রিকাটিকে দীর্ঘদিন ধরেই প্রাণের কাগজ বলে মনে হতো। কিন্তু ওঁর প্রয়াণের পর, বিশেষ করে তৃণমূল সরকার আসার পর পত্রিকাটি আর পাতে দেওয়ার যোগ্য নেই। তাঁবেদারি এবং মোসাহেবির সর্বশেষ সীমাও অতিক্রম করে গেছে পত্রিকাটি। এই অবস্থায় হাতে এসেছিল 'যুগশঙ্খ' নামে কাগজটি। শুনেছিলাম কাগজটি অসমে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারে সবিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। পত্রিকাটির সংবাদ পরিবেশনার ধরন, বাংলা ভাষা জ্ঞান, সাংবাদিকদের জ্ঞানগম্যি কোনওটকেই আপ-টু-দ্য মার্ক মনে হয়নি প্রথম থেকেই, তথাপি, 'বর্তমান' বাদ দিয়ে এই পত্রিকাটি পড়ছিলাম। তার কারণ আর কিছু নয়, হিন্দু বাঙ্গালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছুটা হলেও প্রতিফলন ঘটছিল কাগজটিতে। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্তর ক্ষুরধার লেখনী। কিন্তু আবার আশাভঙ্গ। অন্তত বছর খানেক ধরেই পত্রিকাটিতে ধীরে ধীরে বদল লক্ষ্য করছিলাম। শেষমেষ রন্তিবাবুর ফেসবুকে আসল কারণটি জানা সম্ভব হলো। 'যুগশঙ্খ'ও 'লাইন'-এ এসে গেছে। এমতাবস্থায় পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দেওয়াই কর্তব্য বোধ করলাম। হকার ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কোন পেপার দেব জেঠু? ভেবে চিন্তে আর কোনও কাগজের নামই বলতে পারলাম না। বললাম, এখন আপাতত আর কোনও কাগজ দিতে হবে না। ছেলেটি একটি জেনুইন খরিদ্দার বন্ধ হওয়ায় মনঃক্ষুণ্ণ হলো।

আমি নিশ্চিত আমার মতো বহু বহু পাঠক ইদানীং কাগজ কেনা বন্ধ করে দিয়েছেন। এটি কিন্তু বঙ্গীয় সহিত্য-সংস্কৃতির দিক দিয়ে একটি ক্ষতিকারক প্রবণতা।

স্বস্তিকার কাছে অনুরোধ, আপনারা কি স্বস্তিকা যেমন আছে তেমনই রেখে একটি দৈনিক খবরের কাগজ প্রকাশ করতে পারেন না? আপনাদের কাছে রন্তিদেববাবুর মতো সাংবাদিক তো রয়েছেনই। প্রস্তাবটি ভেবে দেখবেন।

—**দেবাদিব্রত সেন,**
কৃষ্ণনগর, নদীয়াা।

লুণ্ঠিত জগন্নাথ মন্দিরের কথা

গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের লুণ্ঠনের ঘটনায় আমরা ইসলামের প্রকৃত চরিত্র জানতে পারি। শান্তির প্রতীক ইসলামের দোয়ায় কত শত মন্দির ধ্বংস ও মসজিদে ধর্মান্তরিত হয়েছে, সে সব ঘটনা নিয়ে তথাকথিত সেকুলার ইতিহাসবিদরা গবেষণা করেন না। তাঁরা অনুসন্ধন ও প্রচার চান না। তবু সত্য কিন্তু সত্যই। একদিন না একদিন তা প্রচারের আলোকে আসবে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরও যে নানা ভাবে লুণ্ঠিত হয়েছিল, সেই ইতিহাস আজও সেভাবে প্রচারের আলোতে আসেনি। এই মন্দির ১৭ বার মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

লুটেরা ও আক্রমণকারীরা হলো :

১। আরব্য রক্তবাহু, ২। বাংলার নবাব ইলিয়সশাহ, ৩। দিল্লির বাদশাহ ফিরোদশাহ তুঘলক, ৪। ইসমাইল গাজি, ৫। কালাপাহাড়, ৬। কালাপাহাড়, ৭। কালাপাহাড়, ৮ সুলেমান কাররনি ও ওসমান, ৯। মির্জা খুরম, ১০। হাসিমখাঁ, ১১। মকরম খাঁ, ১২। মির্জা আহম্মদবেগ, ১৩। মুতাক্কাদ খাঁ ওরফে মির্জা মককী, ১৪। আমির ফতে খাঁ, ১৫। এক্রাম খাঁ, মস্তরাম খা, ১৬। তকি খাঁ, ১৭। অলেখ ধর্মের প্রতিনিধি।

প্রচারের আলোয় আলোকিত হয়নি, এমন বহুমন্দির আছে যা মুসলমান আক্রমণকারীর দ্বারা লুণ্ঠিত ও ধ্বংস সাধিত হয়েছে। সে ইতিহাস যেমন করুণ, তেমনি বড়োও।

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

'সংকোচের বিহ্বলতা'

'সংকোচের বিহ্বলতা নিজের অপমান, সংকটের কল্পনাতে' এই রবীন্দ্রসংগীতে একটা অংশ আছে— 'হোয়োনা ম্রিয়মাণ— 'আ-া-া-আ'। এই সুরবন্ধে গুরুদেব বলেছেন আপন মাঝে শক্তি ধরে নিজেকে জয় করে দেখো— কত আনন্দ! এই আহা এবং আনন্দর স্থলে 'আ-আ-' সুরমূর্চ্ছনা তিনি বহুবার ব্যবহার করেছেন। 'বাঁধ ভেঙে দাও ভা-আ-া-া-ঙো' সুরলহরীতে বাঁধ ভাঙার আনন্দের সুর প্রকাশ রয়েছে। আমার কলেজ জীবনের প্রিন্সিপ্যাল সদাবন্দনীয় হরিপদ ভারতী মহোদয়ের চিরমধুনিষ্যন্দি বক্তৃতায় এরকম ব্যাখ্য শুনেছি। এইরকম আলোচনা শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ ও শ্রী অমিতাভ চৌধুরীর রচনায় আছে।

গণসমাবেশে সকলে গইতে পারবে না— এই আশংকায় কেউ কেউ 'আ-া-া-আ' সুরাংশটি বাদ দিতে চান। বহু সামাজিক কার্যক্রমে গোটা গানটি আমি গাইতে শুনেছি— কোনো সুরচ্যুতি হয়নি। আগামী ৩০ ডিসেম্বর অখণ্ড ভারতের বন্ধনমুক্তি দিবস উদযাপন উদ্দেশ্যে পদযাত্রা হবে। আমি বন্ধুদের গোটা গানটা শেখাচ্ছি— তাঁরা গইবেন। একটু সচেষ্ট হলে সুর সবার গলায় আসবেই। তা না হলে রবীন্দ্রসংগীতের অঙ্গহানি, অর্থহানি, সুরহানি এই ত্রিপাপ দোষ আমাদের ওপর বর্তাবে। কপিরাইট আইনের আওতায় রবীন্দ্ররচনা এখন নেই। থাকলে এটা ক্রিমিন্যাল অফেন্স হতে পারতো। এ অপকর্ম কারোরই শোভা বাড়ায় না। একান্ত অসুবিধা হলে 'আগুন জ্বালে' গানটি গাওয়া যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রগীতিতে মাতৃবন্দনা শেষ করি 'আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি' ছত্রটি দুবার গেয়ে। এর মাধ্যমে দেশমাতৃকার কাছে এই আত্যন্তিক ইচ্ছা প্রকাশ করি—যেন তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে! এখানের ব্যতিরেক সমস্ত নিবেদনের সৌকর্য বাড়ায়।

—**অমিতাভ সেন,**
৪২, লেক প্লেস,
কলকাতা-৭০০০২৯।

‘সরদারদের মারো একজনও যেন বেঁচে না ফেরে’

শিখ গণহত্যায় সজ্জন কুমারের নির্দেশ

ড. জিষ্ণু বসু

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর রাতে দিল্লির এইমস হাসপাতালের সামনে রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহের গাড়িতে পাথর ছোঁড়া হলো। কারণ তিনি শিখ। সেই রাতে কংগ্রেসের সাংসদ সজ্জন সিংহ, আই এন টি ইউ সি নেতা ললিত মাকেন-সহ উঁচুদরের কংগ্রেস নেতৃত্ব বৈঠক করলেন। একজন শিখকেও বাঁচিয়ে রাখা হবে না।

পরদিন সকাল সাড়ে ছটা। সজ্জন সিংহ রাইফেল হাতে পালাম কলোনির মুখে। পালাম রেল রোডে তখনই শত শত লোক জড়ো হয়েছে। সেই যুবকংগ্রেস সদস্যদের সাংসদ মঙ্গলপুরীর দিকে যাওয়ার কথা বললেন। ‘সরদারদের মারো।’ সজ্জনের পরিষ্কার বক্তব্য ‘ইন্দিরা গান্ধী আমাদের মা, ওরা আমাদের মাকে খুন করেছে!’ সেখান থেকে সকাল ৮টা নাগাদ সজ্জন, কিরণ গার্ডেনে এলেন। সঙ্গে ম্যাটাডোর ভর্তি লোহার রড। কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে বিতরণ করা হলো রড। নিরাপরাধ শিখদের মারার জন্য, বাড়ি লুটের জন্য। সেখান থেকে সকাল ৯টা নাগাদ সজ্জন এলেন সুলতানপুরী। সেখানে আগে থেকেই শ’দেড়েক কংগ্রেস কর্মীকে উপস্থিত করেছিলেন এ-৪ ব্লকের সভাপতি ব্রহ্মানন্দ গুপ্ত। সজ্জনের শিখনিধন, বাড়ি পোড়ানোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ব্রহ্মাননদ কেরোসিন বিতরণের ব্যবস্থা করলেন।

এতবড় হত্যালীলা সম্পন্ন করতে যথেষ্ট কংগ্রেসকর্মী ছিল না। তাই আরও লোক চাই। স্থানীয় মস্তানদের সঙ্গে নিতে হবে। গরিব সাফাই কর্মীদের লাগাতে হবে। সহজ পথ টাকা বিলানো আর মদের বোতল দেওয়া। ৩১ অক্টোবর রাতেই নেতারা সেটা বুঝে যায়। পোড়খাওয়া কংগ্রেস নেতা বলবান খোকার পালামের পণ্ডিত ঋষিকেশের রেশন দোকানে বসা হলো। খবর বিদ্যুতের মতো নেতাদের কাছে পৌঁছে গেল। তৎকালীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এইচ. কে. এল. ভকত এগিয়ে এসে বললেন, ‘আমি আছি।’ বুপ ত্যাগী বলে মাঝারি মানের নেতাকে ডেকে দুহাজার টাকা দিয়ে বললেন, ‘‘এটা দিয়ে মদ আনো আর যা বলেছি ঠিকঠাক করো।... ভয় পেয়ো না। আমি সব সামলে নেব।’’ শ্রমিক নেতা ললিত মাকেনও নিজে হাতে ১০০ টাকা নোট আর মদের বোতল বিলি করেছেন।

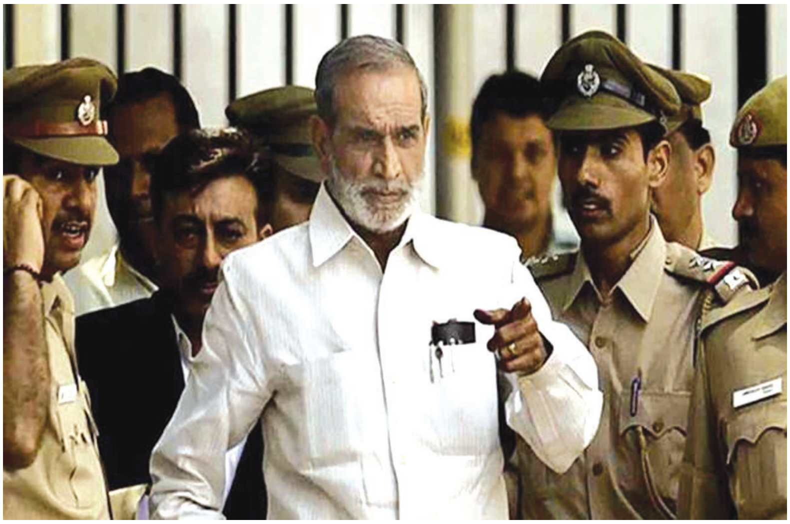

সজ্জনের পরিষ্কার বক্তব্য ‘সরদারদের মারো। ইন্দিরা গান্ধী আমাদের মা, ওরা আমাদের মাকে খুন করেছে!’

সুলতানপুরের ২০ বছরের বেশি পুরাতন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন মোতি সিংহ। সি বি আইকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন সজ্জন কুমারের সেই ভয়ানক ভাষণের কথা। ‘‘যারা সাপের বাচ্চাদের খুন করবে আমি তাদের পুরস্কার দেব। রোশন সিংহ আর বাঘ সিংহকে যে খতম করবে সে পাবে ৫০০০ টাকা। আর যে কোনও শিখ মারলেই ১০০০ টাকা। সাক্ষ্য প্রমাণ-সহ ওই টাকা আমার সহযোগী জয়চাঁদ জমাদারের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন আগামী ৩ তারিখে (৩ নভেম্বর, ১৯৮৪)।’’

৩১ তারিখ রাত্রেই কংগ্রেস পার্টি অফিস থেকে কর্মীদের ভোটার লিস্ট, স্কুল রেজিস্ট্রেশন ফর্ম আর রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছিল। শিখদের বাড়ি খুঁজে খুঁজে কোতল করার জন্য। রাত্রেই প্রাপ্ত তালিকার পাশে ‘এস’ মানে শিখ লিখে চিহ্নিত করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে এত সংগঠিত হত্যা আর

হয়নি। মিশ্র কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে 'দিল্লি স্কুল অব, ইকনমিক্সের' ছাত্র অসীম শ্রীবাস্তব বর্ণনা করেছেন সেই পরিকল্পনা। 'একটু দূরেই কিছু যুবক মোটরবাইক নিয়ে ছিল। যরা দাঙ্গাবাজদের নির্দেশ দিচ্ছিল আর সময় সময়ে করেসিন দিচ্ছিল। মাঝেমধ্যেই কেরোসিন আর জুটের বস্তা নিয়ে অটোরিক্সাগুলো আসছিল।"

এই অমানবিক হিংসাতে সর্বমোট ১৭ হাজার শিখকে হত্যা করা হয়েছিল (এনসাইকোপিডিয়া অব ওয়র : সোশ্যাল সায়েন্স পারস্পেকটিভ জোশেভ পল)। হাজার হাজার শিখের ঘর পোড়ানো হলো (দিল্লি টু রিওপেন এনকোয়ারি ইন টু ম্যাসাকার অব শিখস ইন ১৯৮৪ রায়টস। টেলিগ্রাম, লন্ডন, ৩ মে, ২০১৬)। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম একবার এক নতুন পদ্ধতিতে মানুষ মারা হলো। শিখেদের গলায় জলন্ত টায়ার দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছিল।

অথচ ১৯৮৪ সালের এই ভায়াবহ ঘটনার আঁচ সবাই পেয়েছিল। বিরোধী নেতা ভারতীয় জনতা পার্টির রামজেঠমালানি ৩১ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি ভি নরসীমা রাওয়ের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি জানান যে এইমস হাসপাতালের সামনে রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহ আক্রান্ত হয়েছেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তর যেন এক্ষুনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়। সেদিন দিল্লির লেফটানেন্ট গভর্নর পি জি গাভাই আর পুলিশ কমিশনার এম সি ট্যান্ডন সন্ধ্যায় কয়েকটি উপদ্রুত এলাকাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আসলে কংগ্রেসের হত্যালীলা হয়ে গিয়েছিল। তাই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর সাবলীল উত্তর ছিল, 'একটা বড়ো গাছ পড়লে মাটি তো একটু কেঁপে উঠবেই!"

মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার একের পর এক কমিশন তৈরি করেছে। মারওয়া কমিশন ১৯৮৪, মিশ্রা কমিশন ১৯৮৫, কাপুর মিত্তাল কমিশন ১৯৮৭, জৈন ব্যানার্জি কমিটি ১৯৮৭, পত্তি রোশা কমিটি ১৯৯০, জৈন আগরওয়াল কমিটি ১৯৯০, আহুজা কমিটি ১৯৯০, নারুল্লা কমিটি ১৯৯৩। এরা একজন অপরাধীকেও খুঁজে পাননি। ২০০৪ সালে যখন অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী। তখনই প্রথম কোনও সদর্থক ভূমিকা নেওয়া হলো। সেবছর ফেব্রুয়ারি মাসে গঠিত হলো নানাবতী কমিশন। বিচারপতি জি টি নানাবতীর কমিশনই প্রথম জগদীশ টাইটলার, সজ্জনকুমার ও এইচ কে এল ভকতদের মতো কংগ্রেসের রাঘববোয়ালদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল। তারপর কংগ্রেস আবার ক্ষমতায় এসে চাপা দিয়ে দিল সেই রিপোর্ট।

কিন্তু সেদিনের ঘটনার কারণটাও অনুসন্ধান প্রয়োজন। ৩১ নভেম্বর সকালে দেহরক্ষী সৎবন্ত সিংহ আর বিয়ন্ত সিংহের গুলিতে মৃত্যু হয় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর। আক্রোশ ছিল ১৯৮৪ সালের 'অপারেশন ব্লু স্টার'। মানে শিখদের পবিত্র হরমন্দির সাহিবে ঢুকে হত্যা করা হয় শিখ সন্ত্রাসবাদীদের। অমৃতসরের এই ধর্মস্থানে সেদিন ঘাঁটি গেঁড়েছিল কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী জার্নাল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালে এবং তার সাগরেদরা। অপারেশন ব্লুস্টার সেনা অভিযানে মৃত্যু হয় ভিন্দ্রানওয়ালের। জুন মাসের ১ থেকে ৮ তারিখের এই অভিযানে ইন্দিরা মুক্ত করেন অমৃতসরের ওই গুরুদ্বার, যেটা ১৯৮২ সালের জুলাই মাস থেকেই সন্ত্রাসবাদী চক্রের হাতে চলে যায়। ওখানে ঘাঁটি গেঁড়ে ওই সন্ত্রাসবাদীরা ১৬৫ জন হিন্দু আর নিরঙ্কারী সম্প্রদায়ের মানুষের প্রাণ নেয়। সেই সঙ্গে তাদের সহযোগিতা না করায় ৩৯ জন শিখকেও নিকেশ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নের পিছনেও প্রশ্ন থাকে। কেন ভয়ানক হয়ে উঠেছিল ভিন্দ্রানওয়ালে? কাদের মদতে? যে শিখ ধর্মের সৃষ্টিই হয়েছিল হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য কেন তাদের মধ্যে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি হলো? এর পেছনের ব্যক্তিস্বার্থ, কুৎসিত রাজনীতি আর ক্ষমতালিপ্সাও আলোচনা করা প্রয়োজন।

আশির দশকে কংগ্রেসের সহায়তাতেই ফুলেফেঁপে ওঠে শিখ সন্ত্রাসবাদ। পঞ্জাবে কংগ্রেসের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল আকালি দল। তখনই দমদমি তাকশালের নেতা হিসেবে উঠে আসছিলেন জার্নাল সিংহ ভিন্দ্রানওয়ালে। উগ্র সম্প্রদায়িক এই নেতা ১৯৭৮ সালের শিখ নিরঙ্কারী সংঘর্ষের মূল যন্ত্রী। সেই বছর শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি নির্বাচনে কংগ্রেস ভিন্দ্রানওয়ালেকে সমর্থন করল। এমনকী জৈল সিংহ কংগ্রেসের নেতা হিসাবে শুরুর দিকে মিটিং করার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করলেন। ১৯৮০-র দশকে এক ছোট্ট ইঁদুরকে কংগ্রেস সাহায্য করে ভিন্দ্রানওয়ালে নামক ভস্মাসুর তৈরি করেছিল। তাই স্বাধীন ভারতের আজও সঠিকভাবে বিচার না হওয়া নরহত্যার জন্য আসল দায়ী কে তার সঠিক বিচার হওয়া প্রয়োজন। ■

সাংবাদিক চাই

স্বস্তিকা পত্রিকায় অসম এবং ত্রিপুরার খবরের অভাব অনেকদিন ধরেই আমরা অনুভব করছি। আমরা মনে করি ওই দুই রাজ্যে বসবাসকারী বাঙ্গালিদের জীবনধারণের প্রকৃত ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের কাছে তুলে ধরা দরকার। তাই, ত্রিপুরার আগরতলা এবং উত্তর অসমের শিলচরের যুবক-যুবতীদের প্রতি আমাদের আবেদন, নিউজ রিপোর্টিংয়ে যদি কারও আগ্রহ থাকে তাহলে অবিলম্বে নীচে দেওয়া ঠিকানায় এক কপি পাসপোর্ট-সাইজ ছবি-সহ সংক্ষিপ্ত জীবনীপঞ্জি পাঠান। জীবনীপঞ্জি ই-মেলও করা যেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য ফোন করুন সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বরে।

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০০০৬

Email : swastika 5915@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তরের ফোন নম্বর : ৮৪২০২৪০৫৮৪

শিখ দাঙ্গায় প্রমাণ হয়ে গেল দাঙ্গা করে কারা এবং করায় কারা

কুখ্যাত সজ্জনকুমারের ফাঁসি নয় কেন?

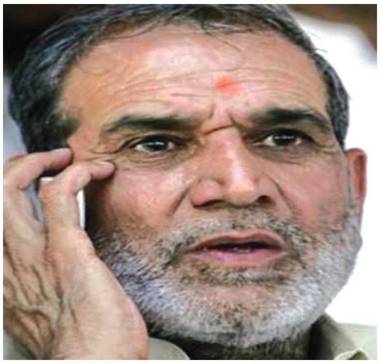

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৮৪ সালের ১ নভেম্বর ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে শুরু হয়েছিল নারকীয় হত্যাকাণ্ড। দিল্লির শাসক ও দেশের শাসক দল কংগ্রেসের সদস্যরা খেপে উঠেছিল শিখ সমাজের বিরুদ্ধে। কারণ তাদের সমাজের দুই সদস্য সৎবন্ত সিংহ এবং বিয়ন্ত সিংহ— প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত রক্ষী— একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে অর্থাৎ যেখান থেকে গুলি করলে যাকে গুলি করা হয় তার মৃত্যু অবধারিত— সেদিন গুলি করেছিল ইন্দিরা গান্ধীকে। চাপ-চাপ রক্তের উপর পড়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন পৃথিবী বিখ্যাত এই মানুষটি। অন্য কেউ তাঁকে সাহায্য করতে আসার আগে নিমেষে এই নৃশংসতম ঘটনাটি ঘটে যায়।

খবর ছড়িয়ে পড়তেই কংগ্রেসি নেতারা যে যা অস্ত্র পান তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তাদের কাছে একটি নির্দেশ— শিখ দেখলেই তার ধড় থেকে মুণ্ডুটা নামিয়ে দাও। সরকারি হিসাব অনুযায়ী ওই একদিনে অর্থাৎ ১ নভেম্বর ১৯৮৪ সালে দিল্লির রাস্তায়, গুরুদ্বারে এবং বিভিন্ন বাড়িতে ৩ হাজার শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। ওই দিন দিল্লির এক শিখ অধ্যুষিত এলাকায় সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির মাথায় চড়ে হাতের মেগাফোনের মাধ্যমে এক কংগ্রেস নেতা চিল-চিৎকার করছিল— 'একটি শিখও যেন পালিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেককে হত্যা করো'--- আজ থেকে ৩৪ বছর আগে শিখদের বিরুদ্ধে এই বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা যে করছিল তারই নাম সজ্জন কুমার--- কংগ্রেসের সংসদ সদস্য এবং দলের চোখের মণি। এতদিন কংগ্রেসিরা তার বাহবা করেছে ও তার অপরাধকে আমলই দেয়নি।

কিন্তু চিন্তাগ্রস্ত আদালত বলেছেন, গণহত্যার অপরাধ যে বা যারা করেছে শাস্তি তাদের প্রাপ্য ছিলই। হ্যাঁ, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এতে একটু বেশি সময় লেগে গেছে। কিন্তু ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে না— বেটার লেট দ্যান নেভার— বিচার একবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়াও ভালো। এক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। কিন্তু ক্রূরচক্রী কংগ্রেস ও তাদের দোসর শেয়ালের দলের মতো 'হুক্কা হুয়া' পার্টিরা একসঙ্গে আওয়াজ তুলেই চলেছিল যে, গুজরাট দাঙ্গার ক্ষেত্রে তাহলে নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহরা অন্য কথা বলছেন কেন?

ব্যাপারটা কি সত্যিই তাই? কংগ্রেস ও তার দোসর হুক্কা হুয়া পার্টিরা গুজরাট দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতটা কী ছিল তা কি একবারও জনগণের সামনে ব্যাখ্যা করেছেন? তাঁরা কি একবারের জন্যও বলেছেন যে অযোধ্যায় রামমন্দিরের জন্য করসেবা করে ফেরত

দিল্লিতে একদিনে অর্থাৎ ১ নভেম্বর ১৯৮৪ সালে ২৭৩৩ জন শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। হিংস্র জনতাকে উস্কানি দিয়েছিলেন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমার। এহেন কুখ্যাত হত্যাকারীর ফাঁসি নয় কেন?

আসা ছাপ্পান্ন জন করসেবককে গোধরা স্টেশনে ট্রেনের কামরায় চতুর্দিক দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করে দিয়ে তার উপর পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মানুষগুলোকে জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ট্রেনের কামরায় এমন ভাবে তালা দেওয়া ছিল যে তা কোনও ভাবেই খোলা যায়নি— ফলে, আটক কোনও করসেবককে বাঁচানোও সম্ভব হয়নি।

মনে পড়ে ২০০২ সালে সাংবাদিকতার কর্ম সূত্রেই আমেদাবাদে গিয়েছিলাম। সেখানে অভাবিতরূপে একটি সম্মেলনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নরেন্দ্র মোদী কথা বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন এবং বলেছিলেন আমি ব্যর্থ হয়েছি, আমি আমার অসহায় ভাই-বোনদের বাঁচাতে পারিনি।'

তবে গুজরাট দাঙ্গার পশ্চাদপট হিসাবে যে ঘটনা সকলকে জানানো দরকার তাহলো— আমেদাবাদ তথা সমগ্র গুজরাট তখন একটি দাঙ্গাপ্রবণ এলাকা হিসাবে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল। প্রতি মাসেই প্রায় সেখানে দাঙ্গা লেগে থাকতো। নরেন্দ্র মোদীর পূর্বে বিজেপির যারা ওখানে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁরা দাঙ্গা পরিস্থিতিকে বাগে আনতে পারেননি। নরেন্দ্র মোদীই সেই মুখ্যমন্ত্রী যিনি গুজরাটের দাঙ্গায় ইতি ঘটাতে সমর্থ হন।

কিন্তু এমন তথ্যের কোনও উল্লেখ তথাকথিত কংগ্রেস ও হুক্কা হুয়া পার্টিরা করেন না। বরং বিজেপি-আর এস এস দাঙ্গা করতে ভালোবাসে— এই প্রচারেই তারা মশগুল থাকে। তখন বিজেপিরই একজন সাংসদ পার্লামেন্টে প্রশ্ন তোলেন যে, দিল্লি (১৯৮৪), গুজরাট (২০০২), মুম্বই ১৯৯৩ এবং উত্তরপ্রদেশে গণহত্যায় কোথায় কতজনকে হত্যা করা হয়েছে তার হিসাব দেওয়া হোক। সংসদের তরফে যে উত্তর দেওয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে একা কংগ্রেস সাংসদ সজ্জনকুমারের নেতৃত্বে দিল্লিতে একদিনে অর্থাৎ ১ নভেম্বর ১৯৮৪ সালে ২৭৩৩ জন শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। সেখানে গুজরাট দাঙ্গায় মোট মৃতের সংখ্যা ছিল ৭২১ জন। প্রসঙ্গান্তরে চলে যাবার আশঙ্কায় ওই রিপোর্টটির বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রণ থেকে বিরত থাকছি। লক্ষ্য করার বিষয় হলো গুজরাটে কিন্তু ২০০২-এর পরে আর তেমন কোনও দাঙ্গার ঘটনা ঘটেনি। কৃতিত্বটা নিঃসন্দেহে নরেন্দ্র মোদীর।

তবে একটা কথা তো ঠিক যে এই ধরনের অপরাধীদের পিছনে রাজনৈতিক মদত থাকে। তাই তারা দশকের পর দশক শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে, এমনকী সজ্জনের মতো অপরাধীরা নিম্ন আদালতের রায়ে মুক্তও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ধর্মের কল তো আর কিছুতে না নড়ুক বাতাসে নড়েই। এখানেও তাই হয়েছে। দিল্লির হাইকোর্ট শেষপর্যন্ত সজ্জনকুমারকে যাবজ্জীবন অর্থাৎ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন তাকে জেলেই থাকার নির্দেশ দিয়েছে। সজ্জনকুমার এখনও কারাগারে প্রবেশ করেননি। আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, তাকে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের (২০১৮) মধ্যে কারাগারে আত্মসমর্পণ করতে হবে। বাকি জীবনটা তাকে জেলেই কাটাতে হবে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের বছর এই কলকাতার বুকে যে নারকীয় হত্যালীলা চলেছিল তাতে একতরফা ভাবে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছিল এবং সেই কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডের নায়ক ছিল সুরাবর্দি এবং ভুলে গেলে চলবে না তার ডান হাত স্বরূপ নায়ক ছিল শেখ মুজিবুর রহমান। সুরাবর্দি ও মুজিবুর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্ম দানের অন্যতম কুশীলব। মুজিবকে তার জাতভাইরাই অন্য প্রেক্ষিতে হত্যা করলেও সুরাবর্দি তেমন কোনও শাস্তিই পায়নি। বরং পাকিস্তানের অন্যতম জন্মদাতা হিসেবে এক ধরনের সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছিল।

গত ১৭ ডিসেম্বর দিল্লির উচ্চ ন্যায়ালয় যে রায় প্রকাশ করে তাতে স্পষ্ট করে বেশ কয়েকটি কথা বলা হয়েছে যাতে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের ঘৃণ্য ও নোংরা চরিত্রের কথা প্রকাশ হয়ে যায়। দিল্লি হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে— ''শুধুমাত্র দিল্লিতে ২৭৩৩ জন শিখকে হত্যা করা হয়েছিল তাই নয়, দেশের অন্য প্রান্তেও শিখ নিধন হয়েছিল।'' তারচেয়ে বড়ো কথা ''কংগ্রেসি সরকারের বদান্যতায় রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছিল অপরাধীরা'। অর্থাৎ এদের শাস্তি দেওয়া ছিল বিচারব্যবস্থার কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। আক্রান্তরা অভিযোগটুকু পর্যন্ত জানাতে পারছিলেন না। পুলিশও এই নৃশংসতার কোনও প্রতিকার করতে পারেনি।''

আদালত তার রায়ে আরও বলে, ''এমনটা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ১৯৮৪-র দাঙ্গায় আক্রান্তদের কার্যত অরক্ষিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। হিংস্র জনতাকে উস্কানি দিয়েছিলেন, সজ্জনকুমার। নিম্ন আদালতের তাকে রেহাই দেওয়া উচিত হয়নি।''

আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, ''১ নভেম্বর ১৯৮৪ সালে দিল্লি জুড়ে শিখদের গাড়ি এবং দোকানে হামলা। হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানেও একই ভাবে আক্রমণ।''

সরকারি হিসেব অনুযায়ী দিল্লিতেই একদিনে ৩ হাজার শিখের মৃত্যু। ২০ হাজার শিখ দিল্লি ছেড়ে পালিয়ে যায়। দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে একই পরিবারের পাঁচজনকে খুন এবং গুরুদ্বারে আগুন লাগানোর অভিযোগে সজ্জনকুমার-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় নানাবতী কমিশনের সুপারিশে।'

''২০১৩ সালে নিম্ন আদালতের রায়ে মুক্ত সজ্জনকুমার, কিন্তু বাকিরা দোষী সাব্যস্ত। হাইকোর্টে সজ্জনের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে সিবিআই।''

বিচারপতি এস মুরলীধর এবং বিচারপতি বিনোদ গোয়েল বলেন, ''যাঁরা দাঙ্গার শিকার, তাঁদের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকলেও শেষপর্যন্ত সত্যের জয় হয়। এই ধরনের অপরাধীদের পেছনে রাজনৈতিক মদত থাকে। তাই তারা দশকের পর দশক ধরে শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে।''

মোট ২৩৭ পাতার এই রায়ে আরও বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ■

চুরাশির শিখ গণহত্যা
কংগ্রেসের ‘কালোহাতে’ রক্তের দাগ

অমিতাভ মিত্র

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে নিজের বিয়ন্ত সিংহ ও সৎবন্ত সিংহের গুলিতে নিজ বাসভবনে ৩১ অক্টোবর, ১৯৮৪ সালে সকাল ৯-২০ মিনিটে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিংহ বিদেশ থেকে ভারতে ফেরার পর ৫-৩০ নাগাদ ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ সরকারি ভাবে প্রকাশ করা হয়। এর পরই রাজধানী দিল্লি-সহ সারা দেশে স্বাধীনোত্তর ভারতের সবচেয়ে বড়ো নারকীয় হত্যাকাণ্ড কংগ্রেস পার্টির দ্বারা সংগঠিত হয়। কেন্দ্র ও দিল্লি-সহ ভারতের প্রায় চারভাগের তিন ভাগে তখন কংগ্রেসের সরকার। সুতরাং কংগ্রেসের তার পার্টি ক্যাডার ও সরকারি মেশিনারি ব্যবহার করে, আধুনিক ভারতের সর্বকালীন ঘৃণ্য নারকীয় নরসংহার করতে অসুবিধা হয়নি। যা ইতিহাসে ‘৮৪ শিখ বিরোধী নরহত্যা’ নামে কুখ্যাত। *(সারণি দ্রষ্টব্য)*

১৯৮৪ লালের ৩১ অক্টোবর সন্ধে ৫-২০ মিনিটে রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহ বিমানবন্দর থেকে সোজা দিল্লির অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল সায়েন্স হসপিটালে ইন্দিরা গান্ধীর মরদেহ দেখতে যান। হসপিটালে ঢোকার সময়ই একদল কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক রাষ্ট্রপতির গাড়ি আক্রমণ করে এবং রাষ্ট্রপতি-সহ শিখ জাতিকে গালিগালাজ দিতে থাকে। এরপরই এইমস্-এর সামনে কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকরা ‘রক্তের বদলা রক্ত’ স্লোগান দিতে দিতে রাস্তার চলন্ত চারচাকা, তিন চাকা ও বাস থেকে শিখদের নামিয়ে পুড়িয়ে মারে। এখান থেকে দিল্লি-সহ সারা ভারতে শিখ নরহত্যা ছড়িয়ে

সারণি

তারিখ	৩১ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ১৯৮৪।
স্থান	দিল্লি, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের প্রায় ৪০টির বেশি শহরে।
কারণ	শিখ নিরাপত্তাকর্মীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু।
পদ্ধতি	অপরাধী দ্বারা সংগঠিত অপরাধ, অগ্নি সংযোগ, গণহত্যা (পিটিয়ে ও জ্যান্ত পুড়িয়ে), অপহরণ, ধর্ষণ, অ্যাসিড ছোঁড়া ইত্যাদি।
ক্ষয়ক্ষতি	কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট।
মৃত্যু	৮০০০ থেকে ১৭০০০ শিখ সম্প্রদায় মানুষের।
পরিণাম	২০,০০০ শিখের দিল্লি থেকে পলায়ন। বহু শিখ যুবকের খালিস্থানি-সহ বেশ কয়েকটি জঙ্গি সংগঠনে যোগদান।
বিচার প্রক্রিয়া	দশটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন, দিল্লি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে অজস্র মামলা।
দিল্লি হাইকোর্ট	সজ্জন কুমারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ।

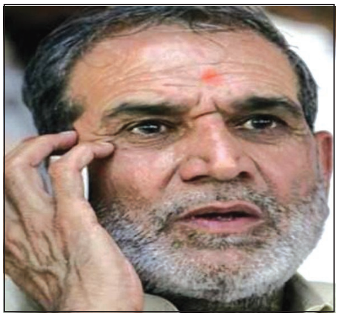
সজ্জন কুমার

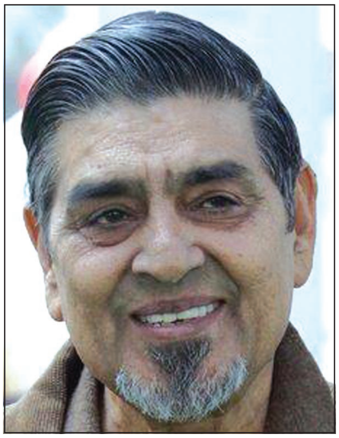
জগদীশ টাইটলার

এইচ কে এল ভগৎ

কমলনাথ

পড়ে।

দিল্লির কংগ্রেস এমপি সজ্জনকুমার, জগদীশ টাইটলার, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ললিত মাকেন, তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী এইচ. কে. এল. ভগৎ প্রভৃতি চাটুকার নেতারা তিহার জেল-সহ বিভিন্ন জেল, সাব-জেল, লকআপ থেকে অপরাধীদের মুক্ত করে দেয়। তাদের শিখদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। এদের হাতে ১০০ টাকার নোট ও মদের বোতল তুলে দেয় এবং বলা হয় শিখদের আক্রমণ করতে হবে। স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা এদের সবরকমের সাহায্যের আশ্বাস দেয়। সজ্জন কুমার বলেন, ‘‘যারা সাপের বাচ্চাদের মারবে, তাদের আমি পুরস্কার দেব। যে রৌশন সিংহ ও বাঘ সিংহকে মারতে পারবে তাকে ৫০০০ টাকা করে পাবে এবং অন্য যে কোনও শিখকে মারলে ১০০০ টাকা করে পাবে। এই টাকা আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্টের কাছ থেকে ৩ নভেম্বর পাওয়া যাবে।” এই ঘৃণ্য প্ররোচনা আরেক স্থানীয় শিখ কংগ্রেস নেতা মোতি সিংহের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়। মোতি সিংহ বিগত ২০ বছর ধরে কংগ্রেস পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

এই সজ্জন কুমারই দাঙ্গাকারীদের প্ররোচনা দিয়েছিল, ‘‘শিখদের আক্রমণ করো, মেরে ফেলো। ওদের সম্পত্তি লুঠ করো, পুড়িয়ে দাও। একজন শিখেরও বেঁচে থাকা উচিত নয়।” কোর্টে সিবিআইয়ের হলফনামা থেকে এসব জানা যায়।

শিকারপুরের কাছে কংগ্রেস নেতা শ্যাম ত্যাগীর বাড়িতে দাঙ্গাকারীদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী এইচ.কে.এল. ভগৎ, শ্যাম ত্যাগীর ভাইকে ২০০০ টাকা মদের জন্য রাখতে দিয়ে বলে, ‘তোমরা একদম চিন্তা করো না, আমি সব দেখে নেব।’ সুলতানপুরের কংগ্রেস নেতা ব্রহ্মানন্দ গুপ্তা কেরোসিন তেল বিতরণ করেন দাঙ্গাকারীদের মধ্যে। এইরকম বহু স্থানীয় নেতা কেরোসিন, ডিজেল ও পেট্রল বিলি করেছিল, যাদের বেশিরভাগ নেতারই তেলের পাম্প ছিল। দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে এই স্থানীয় নেতারা অটো, বাইকে করে তেল বহন করে শিখ মহল্লায় নিয়ে যায়।

দিল্লি পাবলিক স্কুল ও সামার ফিল্ড স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও কংগ্রেসের চারবারের দিল্লির এমপি জগদীশ টাইটলারও সজ্জনকুমার, এইচ কে এল ভগতের মতো হিংসায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদত দিয়েছিল। কংগ্রেস নেতারা ভোটার লিস্ট, স্কুল রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, রেশনকার্ড লিস্ট ধরে ধরে শিখ পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে। কিন্তু দাঙ্গাকারীরা এতটাই অশিক্ষিত ছিল যে তারা লিস্টের নামগুলি ঠিকমতো পড়তে পারত না। তখন কংগ্রেস নেতারা শিখ নামের পাশে ‘S’ লিখে চিহ্নিত করে দিত। শুধু তাই নয়, নেতারা শিখ বাড়ির দেওয়ালে ‘×’ চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিতকরণ করেছিল। যাতে অশিক্ষিত দাঙ্গাকারীরা চিহ্ন দেখে আক্রমণ করতে পারে। শুধু এখানেই শেষ নয়, যে শিখ পরিবারে কোনও পুরুষ উপস্থিত থাকবে না, সেখানে পাগড়ি, ছবিতে দাড়ি, মহিলাদের পোশাক দেখে সনাক্ত করে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে মা-বোন-স্ত্রীদের গণধর্ষণ করে পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এক রাতের মধ্যে দিল্লি মহানগরী ‘জ্বলন্ত মহানগরীতে’ পরিণত হয়। তখনকার বিজেপি নেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীরাম জেঠমালানি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাওয়ের সঙ্গে দেখা করে দাঙ্গা থামানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেন। দিল্লির লেফ্‌টেনেন্ট গভর্নর পি জি গভাই এবং পুলিশ কমিশনার এস সি ট্যান্ডন দাঙ্গা কবলিত স্থান পরিদর্শন করেন।

১ নভেম্বর

সজ্জনকুমার দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় সভা করে গুন্ডা ও কংগ্রেস কর্মীদের উস্কানি দিতে থাকে। যেমন— পাল্লাম কলোনিতে সকাল ৬-৩০ মিনিট থেকে ৭ টা। কিরণগার্ডেনে সকাল ৮টা থেকে ৮-৩০ মিনিট এবং সুলতান পুরীতে ৮-৩০ মিনিট থেকে ৯টা পর্যন্ত। কিরণগার্ডেনে সকাল ৮টা নাগাদ সজ্জনকুমার একট ট্রাক থেকে প্রায় ১২০ জন হামলাকারীকে লোহর রড বিতরণ করে। এটি প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে জানা যায়।

এদিন প্রথম শিখের মৃত্যু হয় পূর্ব দিল্লিতে। উপরোক্ত জায়গাগুলি ছাড়াও ত্রিলোকপুরী, শাদাড়া, গীতা ও মঙ্গলপুরীতে সবথেকে বেশি দাঙ্গা হয়। উল্লেখ্য, যেখানে পুলিশ সামান্য সক্রিয় ছিল সেখানে খুব কম হত্যা ও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যেমন ফার্স বাজার, করোলবাগ ইত্যাদি।

২ নভেম্বর

পুরো শহর জুড়ে কার্ফু জারি ছিল, সেনা মোতায়ন ছিল। কিন্তু সেনা সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারেনি। কারণ দিল্লির বেশিরভাগ জায়গা দিল্লি পুলিশকে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল। দ্য ট্রিবিউন-এ জগমোহন সিংহ খুরমীর বিবরণ থেকে খুব সহজেই জানা যায় দিল্লি পুলিশের বাস্তবিক অবস্থা। খুরমী লেখেন— ‘‘দিল্লি পুলিশের সাহায্য ছাড়া এত বড়ো দাঙ্গা সম্ভব ছিল না। যে পুলিশের দায়িত্ব সাধারণ নিরীহ মানুষকে রক্ষা করা, সেই পুলিশই দাঙ্গাকারীদের পুরো সাহায্য করে। যারা কিনা চাটুকার কংগ্রেস নেতা সজ্জনকুমার, জগদীশ টাইটলার, এইচ কে এল ভগৎ প্রভৃতি নেতার তত্ত্বাবধানে দাঙ্গা করছিল। ওই দাঙ্গাকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল অপরাধী, যারা বিভিন্ন সংশোধনাগারে, উপ-সংশোধনাগারে, পুলিশ হেপাজতে বন্দি ছিল। তাদেরকে মুক্ত করে তিনদিন ধরে সবরকমের সুবিধা ও নির্দেশ দিয়ে ‘শিখদের একটা শিক্ষা’ দিতে চেয়েছিল কংগ্রেস দল।

কিন্তু দিল্লি পুলিশ কিছু করেনি, এটা বলা ভীষণ ভুল হবে। কারণ তারা অতি দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল, সেই সকল শিখদের বিরুদ্ধে যারা কিনা, দাঙ্গার সময় নিজের মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ বাঁচাতে শূন্যে গুলি করেছিল। অতি দ্রুত তাদের গ্রেপ্তার করে কোর্টের চক্কর ও জেলের ঘানি টানিয়েছিল।

৩ নভেম্বর

শয়ে শয়ে মরদেহ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল সায়েন্স হসপিটাল-সহ দিল্লির বিভিন্ন সরকারি হসপিটালে নিয়ে আসা হয়। সারা বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ শুরু হয়। অকংগ্রেসি রাজ্য সরকারগুলি বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসকর্মী ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়। বিজেপি এবং তার শাখা

সংগঠনগুলি শিখদের নিরাপত্তা দিতে থাকে। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি প্রচারমাধ্যম কংগ্রেস ও সরকারের সমালোচনা করতে শুরু করে। অবশেষে বিভিন্ন চাপের কাছে রাজীব গান্ধী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার নতি স্বীকার করে। তবুও চুপিসারে দিল্লির বেশকিছু স্থানে হত্যা এদিনও হয়।

দাঙ্গায় কমলনাথের ভূমিকা

দিল্লির সাংবাদিক সঞ্জয় সুরী তাঁর বইতে লিখেছেন, ''আমি আশা করিনি যে কমলনাথকে রাকাবগঞ্জ সাহিব গুরুদ্বারে দাঙ্গাকারী জনতার মধ্যে দেখবো। যেখানে দু'জন শিখকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ১ নভেম্বর বিকেলে উত্তেজিত জনতার পাশেই কমলনাথের লালবাতি লাগানো সাদা অ্যাম্বাসাডারটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কমলনাথ সাদা কুর্তা-পঞ্জাবি পরে ছিলেন। যে পোশাক তিনি সবসময় পরেন। গাড়ির সামনে ছোটো পতাকা ছিল, সেটা শুধু মন্ত্রীদের গাড়িতে থাকে।'' এই সকল কথা তিনি 'মিশ্রা কমিশন' এবং পরে 'নানাবর্তী কমিশনে' বলেছিলেন। সকলেই জানে, গান্ধী পরিবারের 'পদসেবা' করা বেশ কিছু কংগ্রেস নেতার মধ্যে কমলনাথ অন্যতম। তাই জীবনের শেষ বয়সে এসে, চুল কালো করে, সেই সাদা কুর্তা পঞ্জাবি পরিহিত হয়ে, মা-ছেলে-বৌমা-নাতির (ইন্দিরা- রাজীব- সোনিয়া-রাহুল) জমানায় এসেও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে পারে! তা সে যতই তার বিরুদ্ধে দাঙ্গা-খুনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অভিযোগ থাকুক না কেন। সবই গান্ধী পরিবারের পদসেবার ফল। এত পুণ্য কি বিফলে যাবে!

রাজীব গান্ধী

শিখ গণহত্যায় যাঁর এক ইশারায় একটা প্রাণ যেত না বা এক আনার সম্পত্তিও নষ্ট হতো না বা কোনও দাঙ্গাই হতো না, তিনি হলেন প্রয়াত রাজীব গান্ধী। ৩১ অক্টোবর মায়ের দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লি ফিরে যান। সন্ধ্যার সময় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, নিজের পদ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর আসনের গরিমা তো রাখলেন না, উল্টে নিজেই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে লাগলেন। কংগ্রেস কর্মীরা যখন 'রক্তের বদলা রক্ত' স্লোগান দিয়ে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা করছে, শিখ পুরুষদের জ্যান্ত জ্বালিয়ে দিচ্ছে, মহিলাদের ধর্ষণ করে খুন করছে, তখন তাঁরই নির্দেশে সজ্জন কুমার, জগদীশ টাইটলার, এইচ কে এল ভগৎ, কমলনাথরা জেল থেকে, পুলিশ লক-আপ থেকে কয়েদিদের ছাড়িয়ে, তাদের হাতে টাকা ও মদের বোতল তুলে দিয়ে 'শিখনিধন যজ্ঞে' শামিল হতে বলছেন। তাঁরই নির্দেশে দিল্লি পুলিশ, সি আর পি এফ, দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করতে থাকে। সেনা নামিয়ে তাদের শিখণ্ডীর মতো দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহ নিজে ইন্দিরা গান্ধীর মরদেহ দেখতে 'এইমস্' গিয়ে আক্রান্ত হন। তিন দিন ধরে রাষ্ট্রপতি ভবন ছেড়ে বেরোতে পারেননি। এমনকী কংগ্রেসি নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেনি। উল্টে তাঁর দিল্লির বাসভবনের উপরও একদল দাঙ্গাকারী আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর হিন্দু জামাতা সেই আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। যখন দিল্লি-সহ সারা ভারত দাঙ্গার আগুনে জ্বলছে, রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে হাজারবার ফোন করে পি এম ও-কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়, তখন ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা, উল্টে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বললেন, 'একটা বড়োগাছ পড়ে গেলে, একটু ভূ-কম্পন তো হবেই।'

সুতরাং সবশেষে বলা যায়, এটাই কংগ্রেস পার্টি, যা গান্ধী পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সারা ভারতবর্ষ এই পরিবারের জমিদারি। ভারতবাসী এই পরিবারের গোলাম। এই পরিবারের 'পদসেবা' যে করতে পারবে, সে তত বড়ো পার্টি পদ ও সাংবিধানিক পদ পাবে। হাজার হাজার খুন করলেও আইন আদালত তার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। যেটা সজ্জনকুমার, জগদীশ টাইটলার, কমলনাথের ক্ষেত্রে হয়েছে। হাজার কোটি টাকার ভারতের সম্পদ লুট করলেও তার শাস্তি হবে না। যা পি চিদম্বরমের ক্ষেত্রে হচ্ছে। নিজের স্ত্রীকে খুন করলেও কোনও শাস্তি হবে না, যা শশী থরুরের ক্ষেত্রে হয়েছে। আসলে কংগ্রেসের কালো হাতে খুনের রক্ত আর চুরির পয়সা না থাকলে, ওই হাতের শোভা বৃদ্ধি পায় না! সুতরাং ওই 'কালোহাত' থেকে দেশবাসীকে সাবধান থাকতে হবে। ■

পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড়ে বনবাসী মাতৃসম্মেলন

পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের উদ্যোগে গত ৯ ডিসেম্বর এক মাতৃসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সকালে পাহাড়ের ৫০ টি গ্রামের ৪০০ মা-বোন ধামসা মাদল, শঙ্খ ও উলুধ্বনি সহ স্থানীয় সীতাকুণ্ড থেকে জল নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দুটি শিবলিঙ্গে জল ঢেলে পাশের রামমন্দির প্রাঙ্গণে সম্মেলন স্থলে সমবেত হন। এখানে ৮০০ মা-বোন অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন দক্ষিণবঙ্গের সহ মহিলা প্রমুখ সুশ্রী রেবতী মণ্ডল। অনুষ্ঠানে ২৮ টি গ্রামের সস্ত্রীক মাঝি হাড়ামদের শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি সহযোগে চন্দনের তিলক ও শাল দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। ৩২ বছর আগে সংগঠনের পূর্ণকালীন কর্মীদের পাহাড়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন এমন দুজন মহিলাকেও সংবর্ধনা দেন মহানগরীর দুজন দিদি। বনবাসী নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ধন্যবাদ জানান সুশ্রী মালতী সরেন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে অযোধ্যা পাহাড়ের ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পূজ্য ব্রহ্মচারী পশুপতি মহারাজ, প্রধান অতিথি রূপে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতা উর্মিলা মাণ্ডি এবং বক্তা হিসেবে কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সহ মহিলা প্রমুখ সুশ্রী বীণাপানি দাশ শর্মা, বাঘমুণ্ডি ব্লকের আইসিডিএস-এর সুপার ভাইজার শ্রীমতী সারথি মাহাত ও কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা-হাওড়া মহানগরের মহিলা প্রমুখ শ্রীমতী ঊষা আগরওয়াল উপস্থিত ছিলেন। সম্মাননীয় অতিথিদের বনবাসী নৃত্য সহযোগে মঞ্চে আনা হয়। পূজ্য ব্রহ্মচারী ভারতমাতা, শ্রীরামচন্দ্র এবং কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বালাসাহেব দেশপাণ্ডের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য ও দীপ প্রজ্বলন করে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন। তারপরই পুরুলিয়া ছাত্রীনিবাসের বোনেরা বনবাসী নৃত্য পরিবেশন করেন।

ব্যারাকপুরে পিআইবি-র কর্মশিবির

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি) কলকাতার উদ্যোগে গত ২০ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুরে গণমাধ্যম কর্মশিবির 'বার্তালাপ'-এর আয়োজন করা হয়। শিবিরে জেলার ছোটো বড়ো সাংবাদিকরা যোগ দেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রীমতী চিত্রা গুপ্ত। শিবিরে পিআইবি কলকাতা কার্যালয়ের অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রীমতী জেন নামচু সাংবাদিকদের উদ্দেশে পিআইবি-র কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত করেন। বার্তালাপে অংশ নেওয়া প্রবীণ সাংবাদিকরা তাঁদের পেশাদারি অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলির সুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পিআইবি-র প্রদেয় তথ্যের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করেন। জেলার প্রবীণ সাংবাদিক উদয় বসু ছোটো পত্রিকাগুলির কাছে পিআইবি-র গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের চিফ ম্যানেজার দীপক দে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের জন্য যেসব প্রকল্প শুরু করেছে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। শিবিরে পাঁচজন মহিলা সহ ৫০ জন অংশ নেন। শিবির সঞ্চালনা করেন আধিকারিক শ্রীমতী শ্রীজাতা সাহা সাহু। অডিয়ো-ভিস্যুয়াল পদ্ধতিতে পিআইবি-র ভূমিকা এবং এই প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন শ্রীমতী শ্রীয়াঙ্কা চ্যাটার্জি।

চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে রক্তদান শিবির

মালদহ জেলার চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সেবা সমিতি ট্রাস্টের উদ্যোগে আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণে সম্প্রতি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক শান্তনু বসু এবং প্রধান অতিথি বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী ভবসিন্ধু পাল নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শিবিরের শুভারম্ভ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবদানের কথা তুলে ধরেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক দীপক চট্টোপাধ্যায়। অভিভাবক মনোজিৎ বেরা নেতাজীর ওপর একটি মনোজ্ঞ গীত পরিবেশন করেন। ডাঃ প্রদীপ কুমার মণ্ডল রক্তদানের প্রয়েজনীয়তা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। ৩ জন মহিলা সহ ১৮ জন রক্ত দান করেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যা ভারতীর উত্তরবঙ্গের সহ সম্পাদক জগন্নাথ দাস উপস্থিত থেকে রক্তদানে উৎসাহিত করেন।

মাদপুরে সরস্বতী শিশুমন্দিরের ভবন উদ্বোধন

গত ২৩ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুরে রূপা সরস্বতী শিশুমন্দিরের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয় এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী নীলরুদ্রানন্দ মহারাজ, খড়্গপুর আইআইটি-র অধ্যাপক কাঞ্চন চৌধুরী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় কার্যকর্তা ড. তিলক রঞ্জন বেরা, মেদিনীপুর বিভাগ সঙ্ঘচালক চন্দনকান্তি ভুঞ্যা, বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের দক্ষিণবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক তারকদাস

সরকার এবং রূপা সরস্বতী শিশুমন্দিরের সভাপতি তপন কুমার ঘোড়ই। এছাড়া স্থানীয় কার্যকর্তা, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিশুমন্দিরের ভাই-বোন সহ বহু স্থানীয় মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

রামপুরহাটে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যকারিণী বৈঠক

গত ২২-২৩ ডিসেম্বর বীরভুম জেলার রামপুহাটে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যকারিণীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রান্ত কার্যকারিণীর ১৯ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক গজেন্দ্র সিংহ। তিনি বলেন, 'এটি ভারতের একমাত্র কৃষক সংগঠন যারা গ্রাম ও কৃষক সমাজের সমৃদ্ধির পাশাপাশি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র নির্মাণ করতে চায়। এই সংগঠনের কার্যকর্তাদের গ্রামের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে।' বৈঠকে কার্যকারিণীর প্রতিটি সদস্য এক-একটি জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ মণ্ডল বলেন, বর্তমানে এই প্রদেশে প্রায় ১৩ হাজার কৃষক এই সংগঠনে যুক্ত হয়েছেন। পুরুলিয়া জেলা ছাড়া সব জেলায় সমিতি রয়েছে। বৈঠকে প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ড. কল্যাণ চক্রবর্তীকে সংগঠনের প্রচার প্রমুখ করা হয়েছে। তাঁরই নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের কার্যকরী হোয়টস্ অ্যাপ গ্রুপ। ড. চক্রবর্তী জানিয়েছেন, আগামীতে কিষাণ সঙ্ঘের মুখপত্র হিসেবে একটি ষান্মাসিক কৃষি পত্রিকা প্রকাশিত হবে। তাতে থাকবে সারা বছরের কৃষিকাজের পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় রূপরেখা। কিষাণ সঙ্ঘ জৈব কৃষির গুরুত্ব অনুধাবন করে কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছে। বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জৈব প্রমুখ ভানু থাপাকে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের প্রাদেশিক সভাপতি নন্দলাল কাট। বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকা পালন করবেন প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক অনিল রায়।

নাগরিকপঞ্জির দাবিতে বালুরঘাটে বিদ্যার্থী পরিষদের মিছিল

গত ২১ ডিসেম্বর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে নাগরিকপঞ্জির দাবিতে বালুরঘাট শহরের হিলি মোড় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের এক মিছিল শহর

পরিক্রমা করে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে তিন ঘণ্টার ধরনা কর্মসূচি পালন করে। সেখানে 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল-২০১৬' সংসদে পাশ করানোর দাবিতে বক্তব্য রাখেন এবিভিপি-র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সংযোজক অতনু দাস, জেলা ছাত্র নেতা মণিশঙ্কর ঠাকুর রাজ্য কমিটির সদস্য রাহুল মিশ্র, হিমাংশু মাহাতো, সুনীল পাহান প্রমুখ। ধরনা মঞ্চ থেকে রাজ্যের নাম বদলেরও তীব্র বিরোধিতা করা হয়। কোনও হিন্দু শরণার্থীকে ফেরত পাঠানো হবে না বলে আশ্বস্ত করেন বক্তারা। এনআরসি নিয়ে রাজ্যের শাসকদল মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বলে তাঁরা জানান।

বাঁকুড়ায় কুটুম্ব প্রবোধনের সভা

বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর খণ্ডের ব্রজরাজপুর মণ্ডলের নয়াদা গ্রামে গত ১৮ ডিসেম্বর কুটুম্ব প্রবোধনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন দক্ষিণবঙ্গের কুটুম্ব প্রবোধনের প্রান্ত প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র। উপস্থিত ছিলেন জেলার কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ মানিক চন্দ্র পাত্র এবং জেলার মুখ্য সড়ক প্রমুখ বিধান চন্দ্র আখুলি। সভায় ৪০ জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন। এদিন ৩৮ সদস্যের একটি যৌথ পরিবারে ভোজনের ব্যবস্থা হয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

সোদপুরে সমাজ সেবা ভারতীর সেবাসঙ্গম

সমাজ সেবা ভারতী (পঃ বঃ)-এর উদ্যোগে গত ৮-৯ ডিসেম্বর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের নথিভুক্ত সেবা সংস্থাগুলির কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সোদপুরে কামধেনু গোশালায় এক সেবা সঙ্গমের আয়োজন করা হয়। ২০ টি সেবা সংস্থা থেকে পুরুষ ও মহিলা সহ ২১৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ২৯ জন সেবা প্রমুখ ও ৪০ জন প্রবন্ধক উপস্থিত ছিলেন।

সেবা সঙ্গমে একটি প্রদর্শনী গ্যালারি তৈরি করা হয়। সেখানে বিভিন্ন সংস্থা তাদের পরিচালিত সেবাকেন্দ্রের ছবিসহ পরিচিতি প্রদান করে। এছাড়া ৬ টি স্টলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মা-বোনেরা তাঁদের উৎপাদিত সামগ্রী প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। সকালে প্রদর্শনী উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে সেবা সঙ্গমের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় সমাজ সেবা ভারতীর অখিল ভারতীয় সংযোজক গুরুশরণ প্রসাদ। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রদীপ যোশী, প্রান্ত সেবা প্রমুখ মনোজ চট্টোপাধ্যায়, সহ সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন শ্রীযোশী। সারাদিন চলে বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক, আলোচনা ও পর্যালোচনা। সন্ধ্যায় শ্রীমতী দীপান্বিতা ঘোষের পরিচালনায় হুগলী জেলার বৈদ্যবাটি পাঠদান কেন্দ্রের শিশু-কিশোর এবং প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

সমাপ্তি পর্বে পথনির্দেশ করেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী জি বিদ্যাবতী রেড্ডি ও শ্রীমতী দীপান্বিতা ঘোষ। ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করেন জয়দেব মণ্ডলের নেতৃত্বে স্থানীয় কার্যকর্তারা।

বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তাঁর শিকাগো জয়

সংকর্ষণ মাইতি

বিবেকানন্দকে ভারত তথা বিশ্বের মানুষ জেনেছিলেন আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্মসম্মেলন থেকে। বিশ্ব ধর্মসম্মেলন বা বিশ্বধর্মসভা এমনি এমনি অনুষ্ঠিত হয়নি। একটি উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বা সামনে রেখে বিশ্ব ধর্মসম্মেলন।

গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। কলম্বাস কর্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১৮৯৩ সালে বিশ্ব ধর্মসম্মেলনের আয়োজনের পরিকল্পনা করে নিজেই উদ্যোগী হন। শুধু ধর্মসম্মেলন না, বিজ্ঞান সম্মেলন এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যান্ড ধর্মনিষ্ঠ এবং সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন বলে আমেরিকাবাসী তাঁকে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। যাইহোক, শিকাগো শহর পেয়েছিল ধর্মসম্মেলনের দায়িত্ব।

বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে এই ধর্মসম্মেলন আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ব্যাপারটা বিবেকানন্দের কানে পৌঁছেছিল। তিনি তখন দক্ষিণ ভারতে। ধর্মসম্মেলনে যাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় এবং পশ্চিম ভারতীয় শিষ্যরা তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। আবার জানা যায়, শিকাগোয়, ধর্মসম্মেলনে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশও পেয়েছিলেন। মনে সংশয়, ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনির্ধিত্ব করার ছাড়পত্র মিলবে কিনা?

বিভিন্ন জনের সহায়তায় ১৮৯৩ সালের ৩১ মে বোম্বাই (বর্তমান মুম্বই) থেকে 'পেনিনসুলার' জাহাজে করে জাপানে পৌঁছান। জাপানে কিছুদিন কাটিয়ে ১৮৯৩ সালের ১৪ জুলাই কানাডিয়ান প্যাসিফিক রুটের 'এম্প্রেস অব্ ইন্ডিয়া' নামে একটি জাহাজ চড়েন। জাহাজে জামসেদজি টাটার সঙ্গে আলাপ। বিবেকনন্দ তাঁকে ভারতে শিল্পস্থাপনের কথা বলেন। পরবর্তী সময়ে জামসেদজি টাটা প্রথমে বাঙ্গালোরে গড়লেন 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স', পরে বিহারে বিশাল কারখানা। কারখানা-সহ বিশাল এলাকা 'জামসেদপুর' নামে বিখ্যাত হয়েছে।

যাক, ২৫ জুলাই সন্ধে সাতটায় কানাডার ভেঙ্কুবরে অবতরণ করেন। ওখান থেকে ট্রেনযোগে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৩০ জুলাই রাত্রি সাড়ে দশটায় পৌঁছান। ওখানে থাকার খরচ বেশি বলে বস্টন শহরে যান। ট্রেনে ক্যাথেরিন স্যানবর্ন নামে এক মহিলার সঙ্গে আলাপ। স্যানবর্নও তাঁর খামার বাড়ি 'ব্রিজি মোডাজ'-এ যাচ্ছেন, যেটি বস্টনে অবস্থিত। বিবেকানন্দকে আমন্ত্রণ জানান। আতিথ্য গ্রহণ করেন বিবেকানন্দ। 'ব্রিজি মোডাজ'-এ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেন স্যানবর্ন। বিবেকনন্দের চিন্তা, কীভাবে ধর্মসভায় প্রতিনিধিত্ব করবেন, সেটা নিয়ে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এদিকে স্যানবর্ন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিভিন্ন ক্লাবে, গির্জায় বক্তৃতা দিতে নিয়ে গেলেন। বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিলেন। বস্টনের সংবাদপত্রে তাঁর খবর ও বক্তৃতার কথা প্রকাশিত হয়।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিক ভাষার অধ্যাপক জন হেনরি রাইট পত্রপত্রিকা এবং শিক্ষিত মহলে তাঁর কথা শুনেছেন। সাক্ষাৎ করার ইচ্ছে। সাক্ষাৎলাভ হয়নি। তবে তিনি পত্রের মাধ্যমে বিবেকনন্দকে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণপত্রটি পেয়ে অধ্যাপক রাইট-এর আটলান্টিকের তীরে অ্যানিস্কোয়াম গ্রামে যান। আলাপচারিতায় দারুণ মুগ্ধ জন রাইট। রবিবার গির্জায় নিয়ে যান। সেখানে ভাষণ দিতে হয় বিবেকানন্দকে। সকলে মুগ্ধ। এরপর আরও কয়েকটি জায়গায় বক্তব্য রাখেন। ১১ সেপ্টেম্বরের আগে তিন সপ্তাহ ১১টি জায়গায় (পরিব্রাজক স্বামীজী পুস্তকে উল্লেখ ১২টি) ভাষণ দিতে হয়েছে।

ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে বিবেকানন্দকে অধ্যাপক জন রাইট অনেকটাই সহযোগিতা করেছিলেন। শিকাগো যাওয়ার টিকিট, কিছু ডলার দিয়েছিলেন। ধর্মমহাসভার এক কর্মকর্তাকে দেওয়ার জন্য একটি পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন। এবং ধর্মসভার ঠিকানা। সম্মেলনে থাকাকালীন এসবই বাহক মারফত পেয়েছিলেন বিবেকানন্দ।

৯ সেপ্টেম্বর ট্রেনে করে শিকাগোতে যাচ্ছেন। স্টেশনে নেমে দেখেন ঠিকানা (ড. ব্যারোজের ঠিকানা) হারিয়ে ফেলেছেন। রাত্রি

হয়েছে। রেলে মাল রাখার জায়গায় একটি খালি বাক্সে রাত কাটালেন। 'লেকশোর ড্রাইভ'-এর ধারে সকালে এক ধনী বাড়ির দোরে দাঁড়ালেন। ঠিকানা জানা ও খাবার দেওয়ার জন্য আবেদন জানালেন। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন কেউ, আবার কেউ বন্দুক দেখিয়েছেন। অগত্যা রাস্তার ধারে বসে থাকা। সব কিছু ঈশ্বরের ওপর ছেড়ে দিলেন। কাজ হলো। একটি বাড়ি থেকে শ্রীযুক্তা হেল (জর্জ ডব্লিউ হেলের সহধর্মিণী) কাছে এসে পরিচয় জেনে বাড়িতে নিয়ে যান। শ্রীযুক্তা হেলের অতিথি হলেন। সব কিছু বিবেকানন্দের কাছে জেনে ব্রেকফাস্টের পর ধর্মমহাসভার অফিসে নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক জন রাইটের দেওয়া পরিচয়পত্রটি পেয়ে বিবেকানন্দকে ধর্মসভায় হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করা হলো। থাকার ব্যবস্থা ২৬২ নং মিশিগান অ্যাভিনিউস্থিত শ্রীযুক্ত জে. বি. লায়নের গৃহে।

বিশ্বে ধর্মসভা এই প্রথম। উদ্যোক্তাগণ ধর্মসভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে দশটি প্রধান বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কী কী সাধারণ সত্য রয়েছে তা দেখানো। প্রতিটি ধর্ম এবং খ্রিস্টান চার্চের বিভিন্ন শাখা যে সত্যগুলিকে তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে সেগুলো নির্দিষ্ট করে দেখানো, বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরকে কীভাবে আলোকিত করতে পারে—তা আলোচনা করা, শিক্ষা, দারিদ্র্য প্রভৃতি ব্যবহারিক সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনো আলোকপাত করতে পারে কিনা, তা দেখা, বিভিন্ন দেশ ও জাতিগুলিকে অধিকতর সৌহার্দ্যসূত্রে বাঁধা, যাতে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির পথ সুগম হয় ইত্যাদি।

শিকাগোর আর্ট ইনস্টিউটের বৃহত্তম কক্ষ 'হল অব্ কলম্বাস'-এ ধর্মসভা। ধর্মসভার মঞ্চটির দৈর্ঘ্য একশো ফুট, চওড়া পনেরো ফুট। মঞ্চের পেছনে হিব্রু ও জাপানি ভাষায় লিখিত দীর্ঘলিপি। দু'জন গ্রিক দার্শনিকের প্রতিমূর্তি, দার্শনিকদের পরে দক্ষিণে সরস্বতীদেবী সদৃশ একটি মূর্তি উত্তোলিত হস্তে দণ্ডায়মান। মঞ্চের মাঝে লোহার সিংহাসন— উদ্‌বোধকের জন্য নির্দিষ্ট। তিন সারিতে ত্রিশটি করে কাঠের চেয়ার পাতা— প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাদের বসার জন্য নির্দিষ্ট। বক্তাদের জন্য একটি রসট্র্যান্স (বক্তৃতামঞ্চ)। বিবেকানন্দ বসেছিলেন ৩১ নম্বর চেয়ারে। ভারত থেকে ব্রাহ্মধর্মের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, জৈনধর্মের বীরচাঁদ গান্ধী, হিন্দুধর্মের বিবেকানন্দ, সিংহল থেকে বৌদ্ধধর্মের অনাগরিক ধর্মপাল প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত। অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশ থেকে। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথিরা হলেন— ওয়ার্ল্ডস কংগ্রেস অক্সিলিয়ারি অব দ্য কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন নামে কমিটির প্রেসিডেন্ট চার্লস বনি। ইনি ধর্মসভার সভাপতি। সম্মেলনের দয়িত্বে থাকা ফার্স্ট প্রেম- বিটেরিয়ান চার্চের ধর্মীয় নেতা জন হেনরি ব্যারোজ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান যাজক কর্ডিনাল গিবিনস। ইনি ধর্মসভার উদ্‌বোধক। ধর্মসভার সামনে ও গ্যালারিতে উপস্থিত সাত হাজার নর-নারী।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে বিশ্বধর্মসভা শুরু। ঠিক দশটায় সমবেত দশটি ধর্মমতের (ইহুদি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, তাও, কনফুসিয়াস, শিন্টো, পারসিক, গ্রিকচার্চ ও খ্রিস্টধর্ম) উদ্দেশ্যে ঘণ্টাধ্বনি হলো। দশটি ধর্ম, দশটি বিষয়, সকাল দশটা— দশ সংখ্যাটি ব্যঞ্জনাময়। অর্গ্যান বাদন, সংগীত ও সভাপতির বাইবেলোক্ত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ধর্মসভা শুরু। সকালে প্রথম বক্তা ছিলেন আর্চবিশপ অব্ জান্তে। এরপর অন্যান্যরা। সকালে বিবেকানন্দকে আহ্বান জানানো হয়। তিনি না করে দেন। বিকেলে বলবেন, অনেকের লিখিত ভাষণের পর উনি বলতে উঠলেন। সকলের মতো ওঁরও পরিচয় করে দেওয়া হলো। বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিতে রসট্র্যান্সের কাছে দাঁড়ালেন। দেবী সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে মেঘমন্দ্র কণ্ঠে প্রথমে আমেরিকাবাসীদের সম্বোধন করলেন—

'সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অব আমেরিকা'। বিবেকানন্দের এই সম্বোধনে হাজার হাজার নর-নারী দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি সহকারে করতালি দিলেন। করতালি স্থায়ী হয়েছিল দু' মিনিট। সম্বোধনের পর ভাষণ।

'আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরব বোধকরি, যে ধর্ম জগৎকে শিখিয়েছে সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন গ্রহিষ্ণুতার আদর্শ। আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্য করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গর্ববোধ করি, যে জাতি সব জাতির নিপীড়িত ও শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে এসেছে। সাম্প্রদায়িকতা গোঁড়ামি এবং তার ভয়াবহ ফলশ্রুতি ধর্মোন্মত্ততা বহুদিন ধরে এই সুন্দর পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছে, জগৎকে তারা হিংসায় পরিপূর্ণ করেছে, মানুষের রক্তে সিক্ত করে দিয়েছে এবং জাতির পর জাতি এর ফলে হতাশায় নিমগ্ন হয়েছে...। আমি আন্তরিক ভাবে আশা করি এই সম্মেলনের সম্মানে আজ যে সকালে ঘণ্টাধ্বনি হলো, তা যেন সমস্ত ধর্মোন্মত্ততা, সমস্ত অতাচারের মৃত্যুঘণ্টা হয়।'

বক্তৃতা শেষ হতেই সাত হাজার নরনারী হর্ষধ্বনি করে ধন্যবাদ জানান। শ্রীযুক্তা এস.কে. ব্লজেন্ট ওইদিন ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন—

'যখন বক্তৃতা শেষ হলো, তখন দেখলাম দলে দলে নারীরা তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্য বেঞ্চ ডিঙিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মঞ্চের দিকে। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, 'দেখ বাছা, এ আক্রমণে যদি তুমি মাথা ঠিক রাখতে পার, তবে বুঝব তুমি নির্ঘাত ভগবান।'

নারীদের স্পর্শ-প্রতিক্রিয়াটি যেমন চিত্তাকর্ষক ছিল, তেমন ভাষণ। শিকাগো শহরের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর তেজোদৃপ্ত ছবি টাঙানো হয়েছিল। সংবাদপত্র তো আছেই। সতেরো দিন সম্মেলন চলছিল। বিজ্ঞান সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। ধর্মের চেয়ে কর্মকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কর্মই ধর্ম। Work is worship। মানবতাবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতটি ছিল এইরকম—

'মানবতাবাদ মূর্ত হয়ে উঠবে একত্বের মধ্য দিয়েই। হিন্দুর অধ্যাত্মচিন্তা, খ্রিস্টের প্রেম, ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব একত্ব হয়ে বিশ্বধর্মের রূপ নেবে। মানবতাবাদই হবে বিশ্বধর্ম— বিশ্বের একমাত্র ধর্ম।'

ঋষি অরবিন্দ বলেছেন— 'ভারতবর্ষ জাগছে। জাগছে শুধু বেঁচে থাকর জন্য নয়। ভারতবর্ষ যদি পৃথিবীকে জয় করে তবে তা করবে ভাবাদর্শের দ্বারা— প্রেম-মৈত্রী-উদারতার দ্বারা। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতায় তারই সূচনা ঘোষিত হয়েছিল।'

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে তাঁর 'চিত্রা' কাব্য পাঠ করেছিলেন শিকাগোর কলম্বাস হলের ওই মঞ্চে। তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। এখানে বিবেকানন্দের স্মৃতি ফলকের উদ্বোধন হয়েছে ২৯.১.২০১২ সালে, সার্ধ জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে। ▌

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

ল্যান্সলট থমাস হজবেন : (১৮৯৫-১৯৭৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ভাষ্যকার, সাম্যবাদী এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক পরিসংখ্যানবিদ। তাঁর বিশেষ অবদান হচ্ছে, জীববিজ্ঞানের গবেষণার উপযোগী জেনোপাস লেভিসের আবিষ্কার।

উদ্ধৃতি : গণিতশাস্ত্রের ইতিহাসে গণনা শৃঙ্খলার শুরুতে '০' শূন্যের মতো সাংকেতিক চিহ্নের যুগান্তকারী উদ্ভাবনের চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু ছিল না।

উৎস : ম্যাথমেটিক্স ফর দ্য মিলিয়ন— লান্সলট থমাস হজবেন।

স্টানলি ওলপার্ট : (১৯২৭...)

পরিচিতি : ইনি আমেরিকার অন্যতম লেখক ও ইতিহাসকার। তাঁকে সারা বিশ্বের মধ্যে ভারত এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বলে মান্যতা দেওয়া হয়। তিনি লস্ অ্যাঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুদিন অধ্যাপনা করেন।

উদ্ধৃতি : গণিতশাস্ত্রের মতো বিজ্ঞানে ভারতীয়দের অবদান সর্বাধিক। সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানে রাশির স্থানাঙ্ক নির্ণয়, দশমিক পদ্ধতি, ১ থেকে ৯-এর সংখ্যার সাংকেতিক চিহ্ন এবং সর্বব্যাপী শূন্যের আবিষ্কার, ভারতীয়দের অসামান্য প্রতিভার প্রতীক। ওইগুলির অভাবে আধুনিক যুগের কম্পিউটার, পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত উপগ্রহ, মাইক্রোচিপ্‌স এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গবেষণা অসম্ভব হতো। সমস্ত সংখ্যার মধ্যে শূন্য যা সবচেয়ে ছোটো অথচ সব থেকে মহত্তপূর্ণ, তা মানবজাতিকে দেওয়া ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহার্ঘ উপহার।

উৎস : অ্যান ইন্ট্রোডাক্‌সন টু ইন্ডিয়া— স্টানলি ওলপার্ট।

পল উইলিয়াম রবার্টস : (১৯৫০—)

পরিচিতি : ইনি কানাডার অন্যতম বিদ্বান, ঔপন্যাসিক, সাহিত্য সমালোচক, সাংবাদিক, টিভির চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজক। তিনি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকও ছিলেন।

উদ্ধৃতি : সমস্ত ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জগতের পশ্চাতে বেদ পরমসত্তাকে দর্শন করে। সমগ্র সৃষ্টি আমাদেরকে স্রষ্টার কাছে নিয়ে যায়, পরম সত্যে উপনীত করে, সেখানে সৃষ্টি এবং স্রষ্টা একীভূত হয়ে গিয়েছে।

উদ্ধৃতি : আজ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে, তার মধ্যে বেদই একমাত্র বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্য প্রকাশ করে। আর এই বেদের জন্যই আমি প্রথম ভারতে আসি, এখানে থেকেছিলাম এবং সেই দেশ এখনও আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

উদ্ধৃতি : ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে আমি স্বদেশে গৃহের ন্যায় স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। আর এই একমাত্র দেশ, যেখানে উড়োজাহাজ থেকে নেমেই, আমি তার মাটি চুম্বন করেছিলাম।

উৎস : এম্পায়ার অব দ্য সোল-সাম জার্নিস ইন ইন্ডিয়া— পল উইলিয়াম রবার্টস।

মারকাস দ্যু সাটয় : (১৯৬৫...)

পরিচিতি : ইনি একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন বহুদিন। তিনি ইংল্যান্ডে 'ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাসেসিয়েসনের' সভাপতি হন। তিনি পরে 'পাবলিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব সায়েন্সের' 'সিমোনী প্রোফেসর' পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সারাজীবনে তিনি অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর বিশেষ অবদানটি হলো, 'গ্রুপ' এবং 'নাম্বার' থিয়োরিতে গবেষণা। তিনি গবেষণার কাজে ভারতে আসেন এবং ভারতীয় ঋষিদের প্রগাঢ় প্রজ্ঞার দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর লেখা সবচেয়ে জনপ্রিয় পুস্তকগুলি হলো, 'দ্য মিউজিক অব দ্য প্রাইমস' এবং 'এ ম্যাথামেটিক্যাল ওডিসি থ্রু এভরিডে লাইফ'।

উদ্ধৃতি : বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি π (পাই)-এর প্রেমে পড়েছিলাম। ভগ্নাংশের ক্রমান্বয়ে যোগ এবং বিয়োগের রাশিমালা দ্বারা π কে প্রকাশ করা যায়। আমাদের পাঠ্যক্রমে শেখানো হয়েছিল, যে এটা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ গট্‌ফ্রিড লিব্‌নিজের আবিষ্কৃত 'লিব্‌নিজ সূত্র'। তিনি ক্যালকুলাসের সহায্যে এই 'পাই'-এর নির্ণয় করেন। স্যার আইজ্যাক নিউটন এবং লিব্‌নিজ বিখ্যাত হয়েছিলেন ওই ক্যালকুলাসের কারণে।

উদ্ধৃতি : আমি প্রচণ্ড ধাক্কা পেয়েছি সম্প্রতি যখন আমি জানতে পারি যে দক্ষিণ ভারতের 'কেরল' প্রদেশে ভারতীয় গণিতজ্ঞরা বহু শতাব্দী পূর্বেই এই সূত্রের ব্যবহার জানতেন। কার্যত এই সূত্রের নাম হওয়া উচিত ছিল 'মাধব সূত্র', সেই মহান ভারতীয় গণিতজ্ঞের নামানুসারে যিনি প্রথম উদ্ভাবন করেছিলেন। ভারতে, π (পাই)-ই একমাত্র অবিস্মরণীয় গণিতের আবিষ্কার ছিল না, ঋণাত্মক সংখ্যা এবং শূন্যের ধারণা যা চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপে এসেছিল তা আসলে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ছিল সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই।

উৎস : দ্য টেলিগ্রাফ, ডেলি, ইউ. কে.।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)
অনুবাদক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাস

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

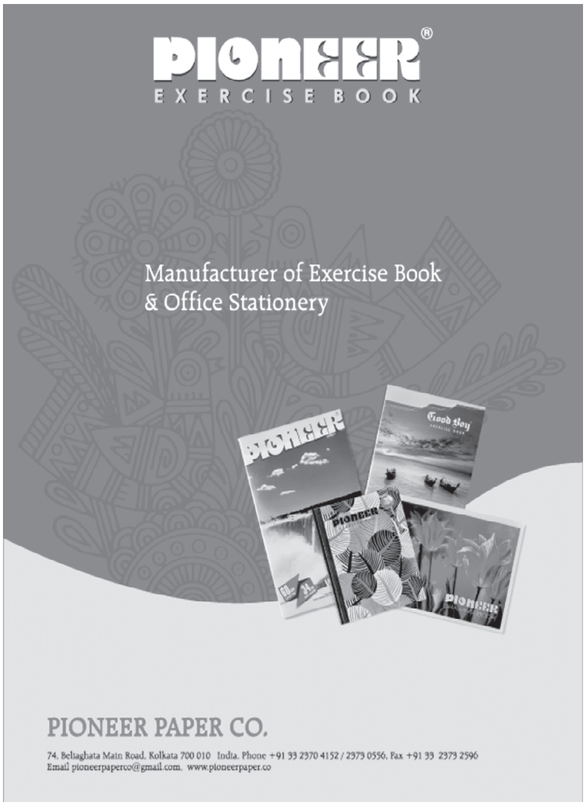

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

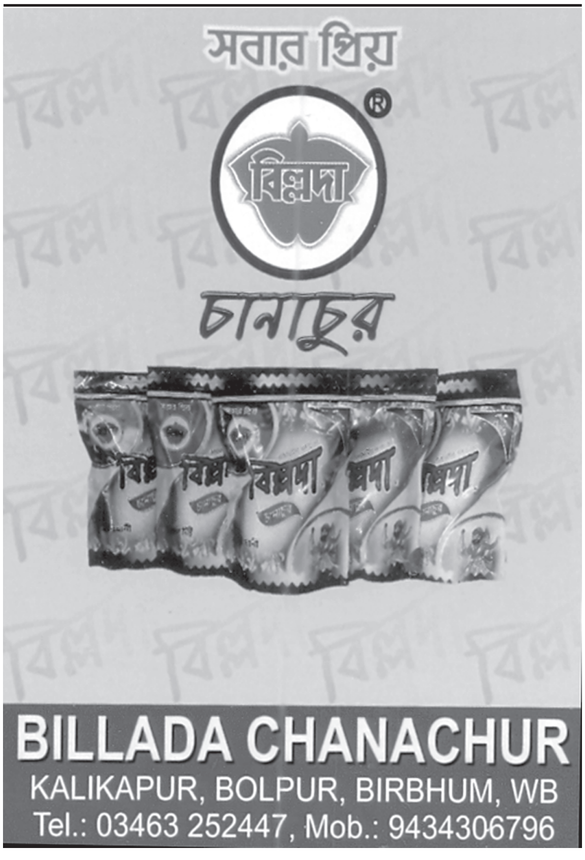

যোদ্ধা

পিন্টু ভট্টাচার্য্য

এর আগে আরও চারটে ভোট করেছে জয়ন্ত। কিন্তু এত ভালো পোলিং স্টেশন আগে পায়নি। পোলিং স্টেশনটি একটি প্রাইমারি স্কুলে। স্কুলটির নাম ব্রজেশ্বরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামের একপ্রান্তে স্কুলটি। নতুন পিচের রাস্তা স্কুলে এসে শেষ হয়েছে। প্রাইমারি স্কুল হলেও বেশ ঝকঝকে। ঘরটা যথেষ্ট বড়ো। ইলেকট্রিক আলো ও পাখার ব্যাবস্থা রয়েছে। পায়খানা-বাথরুমও বেশ পরিষ্কার, একটা আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল আছে। সবচেয়ে বড়ো কথা স্কুলের পাশেই একটা ছোট্ট চায়ের দোকান রয়েছে, সেখানে টুকটাক অন্যান্য দরকারি জিনিসও পাওয়া যায়। ভোটের ডিউটি করতে এসে আর কী চাই? ব্যালট বাক্স এবং অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র ঘরে রেখে জয়ন্তই বলল— চলুন, পাশের দোকানে চা-টা আগে খেয়ে নিই, তারপর ফ্রেশ হয়ে নিয়ে কাজ শুরু করব।

সকলে একবাক্যে রাজি হয়ে গেল। সকলে বলতে আরও চারজন পোলিং অফিসার, একজন বন্দুকধারী কনস্টেবল আর একজন সিভিক পুলিশ। মোট সাতজনের টিম। জয়ন্ত এই টিমের নেতা মানে প্রিসাইডিং অফিসার। ফার্স্ট পোলিং অফিসার রমেনবাবু একটি হাই স্কুলের ক্লার্ক। ভদ্রলোকের পঞ্চাশের ওপর বয়েস, তবে যথেষ্ট কর্মঠ এবং অভিজ্ঞ। ভোটের কাজেও যে রমেনবাবু যথেষ্ট দক্ষ তা সকালে রিসিভিং সেন্টারেই বুঝেছিল জয়ন্ত। সেকেন্ড পোলিং, থার্ড পোলিং, ফোর্থ পোলিং, সিভিক পুলিশ প্রত্যেকেরই বয়স তিরিশের মধ্যে। সেকেন্ড আর থার্ড পোলিং অফিসার দুজনেই প্রাইমারি স্কুলের টিচার, এক বছরও হয়নি জয়েন করেছে। এই প্রথমবার তাদের ভোটের ডিউটিতে আসা। তবে দুজনেই বেশ চটপটে এবং বুদ্ধিমান। এই দলে একমাত্র বেমানান কনস্টেবল ভদ্রলোক, ষাটের কাছে বয়েস, চেহারা দেখলেই বোঝা যায় একসঙ্গে অনেকগুলো রোগে ভুগছেন। নিজের বন্দুকটা টানতেও বেশ কষ্ট হচ্ছে। সঙ্গের ব্যাগটা চাপিয়ে দিয়েছেন সিভিক পুলিশটির ঘাড়ে। বুথের নিরাপত্তার প্রধান দয়িত্ব এরই কাঁধে।

ভোটের আগের দিন রাতে অনেক কাজ থাকে। ভোটকক্ষ তৈরি করা, ঘরটাকে একটু সাজিয়ে নেওয়া, পোলিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং এজেন্টদের বসার জায়গার ব্যবস্থা করা এবং আরও টুকটাক কিছু কাজ। ভোট শেষ হওয়ার পর রিসিভিং সেন্টারে ব্যালট বাক্সের সঙ্গে পূরণ করা একগুচ্ছ ফর্ম জমা দিতে হয়। সবগুলো ফর্ম ঠিকঠাক না থাকলে রিসিভিং সেন্টারে অফিসাররা জমা নিতে চায় না। তখন বাধে আর এক ঝামেলা। প্রথমবার ভোট করতে গিয়ে জমা দেওয়ার সময় খুব ভুগেছিল জয়ন্ত। সব কাজকর্ম সেরে জমা দিতেই ভোর হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাড়ি ফেরার আর এক হ্যাপা। তারপর থেকে ভোটের আগের দিন রাতে ফর্মের কাজ যতদূর সম্ভব সেরে রাখে সে। পঞ্চায়েত ইলেকশন তিনটে টায়ারে হয় বলে ফর্মের সংখ্যাও অনেক বেশি। সেই ফর্মগুলো যথাযথ পূরণ করে নির্দিষ্ট খামে পুরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা যাতে দরকারের সময় ঠিক হাতের কাছে পাওয়া যায়, প্রায় তিন হাজার ব্যালটের পিছনে সই করা আর ডিস্টিংগুইসিং মার্কের সিল মারা— কাজের চাপ খুব কম নয়। রমেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এই কাজগুলোই সারছিল জয়ন্ত। সেকেন্ড পোলিং অফিসার বলল— স্যার, পোলিং বুথ তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। পোলিং এজেন্ট আর

পোলিং অফিসারদের লেবেল, এক্সিট, এন্ট্রান্স আর অন্যান্য কাগজগুলো দেওয়ালে মেরে দিয়েছি। বয়সে ছোটো বলে জয়ন্ত এদের সঙ্গে তুমি করেই কথা বলছিল। ফর্ম ফিলআপের কাজ করতে করতেই বলল— তোমরা একটু বাইরে থেকে ঘুরে-টুরে এসো। আর ওই চায়ের দোকানদারের সঙ্গে আজ রাত আর কাল সকালের টিফিন আর দুপুরের খাবারদাবারের ব্যাপারে কথা...

—ভিতরে আসব স্যার? জয়ন্তর কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা ভারিক্কি কণ্ঠস্বর ভেসে এল দরজার কাছ থেকে। জয়ন্ত ফর্মের স্তূপ থেকে চোখ তুলে আগন্তুকের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল— আসুন।

আগন্তুক ভদ্রলোক বেশ স্বাস্থ্যবান, ছ' ফুটের কাছে লম্বা, মুখে চাপ দাড়ি, মাথার অর্ধেক চুল পাকা, গায়ের রঙ বেশ কালো, বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন। তার সঙ্গে আরও তিনটি স্বাস্থ্যবান ইয়াং ছেলে। ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেও ছেলে তিনটি কিন্তু দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকল। লোকটি জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বলল--- আপনি নিশ্চয়ই প্রিসাইডিং অফিসার। আমার নাম আমজাদ আলি। রাস্তার ওপাশের দোতলা বাড়িটা আমার। আমি এই গ্রামের দশ বছরের মেম্বার। এবার সিটটা মহিলাদের জন্য রিজার্ভ হয়ে যাওয়ায় ভোটে দাঁড়াইনি। আমি এলাম আপনাদের সুবিধা অসুবিধা দেখার জন্য। আর একটা কথা, আপনাদের খাবার কিন্তু আমার বাড়ি থেকেই আসবে, আপনারা ও নিয়ে একদম ভাববেন না।

জয়ন্ত বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। ভোট করতে এসে এভাবে কোনও দলের লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে, তাদের দেওয়া খাবার দাবার বা অন্য কিছু নিতে ট্রেনিঙে বারবার বারণ করা হয়। এতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠতে পারে, বড়োসড়ো গোলমাল হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু এসব কথা মুখের ওপর বলা যায় না। জয়ন্ত তাই একটু ইতস্তত করছিল, কী বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। আমজাদ তার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল— আপনি আপত্তি করবেন না। আমাদের গ্রামের এটাই নিয়ম। মেম্বার যে থাকে, ভোটকর্মীদের সেই খাওয়ায়। এতে কোনও পার্টিই আপত্তি করে না। আপনারা গ্রামের অতিথি, নিজেরা খরচ করে খাবেন— এটা গ্রামের অপমান। আপনারা কাজ করুন, আমি সময়মতো খাবার পাঠিয়ে দেব।

এর পরে আর আপত্তি চলে না। সকলেই বেশ খুশি হয়ে উঠল। ভোট নিতে এসে যে এত সুন্দর পরিবেশ আর আতিথেয়তা পাওয়া যাবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। টেনশনের লেশমাত্র নেই। রাত ন'টা নাগাদ দুটো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে খাবার নিয়ে এল আমজাদ আলি। ছেলে দুটোই পরিবেশন করল, বেশ যত্ন করেই খাওয়াল ওরা বেগুন ভাজা, ডিমের ঝোল আর গরম ভাত। যাবার সময় বলে গেল কাল পুকুর থেকে জ্যান্ত কাতলা মাছ ধরে তার ঝোল রেঁধে খাওয়াবে।

কাজ প্রায় গুটিয়ে ফেলেছিল জয়ন্ত। বাকিটুকু কাল ভোরে উঠে করলেই চলবে। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া দরকার। কাল সারাদিন টানা কাজ, সব সেরে বাড়ি ফিরতে ভোর হয়ে যাবে, কপালে থাকলে পরশু সকালও হয়ে যেতে পারে। মাটিতে একটা চাদর পেতে নিল জয়ন্ত, পাম্প বালিশটা ফুঁ দিয়ে ফোলাল, লাগেজ হাল্কা রাখার জন্য মশারি আনেনি। পায়ের কাছে একটা গুড নাইট জ্বেলে দিল। এটাই আজ রাতের শোওয়ার ব্যবস্থা। সব ব্যবস্থা সেরে মাধবীকে ফোন করল জয়ন্ত। সেই দুপুরে ভোটকেন্দ্রের নামটা জানিয়েছিল, তারপর আর কথা বলা হয়নি। মাধবী ফোন ধরতেই বলল— গুড্ডু কী করছে।

—কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে রাখাই মুশকিল।

গুড্ডু জয়ন্তর ছেলে। বছর পাঁচেক বয়স, বাবাকে ছেড়ে থাকতেই পারে না। কিছুতেই তাকে ভোটে আসতে দেবে না। উপায় থাকলে সে আসতও না। কিন্তু উপায় নেই, চাকরির দায় বড়ো দায়। ছেলেটার মুখটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। চোখটা ছলছল করে উঠল তার, কিন্তু মাধবীকে কিছু বুঝতে না দিয়ে বলল— এখানকার লোকজন খুব ভালো, খাবার সব ব্যাবস্থা এরাই করেছে। আমাদের কোনও ঝামেলা পোয়াতে হয়নি। এরকম ভালো জায়গা পাওয়া যায় না।

—কাল সুযোগমতো ফোন করো, আমি কিন্তু চিন্তায় থাকব।

—ঠিক আছে। বলে ফোনটা কেটে দিল জয়ন্ত।

ঘটনাটা ঘটল দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর। এমনিতে নির্বাচন কমিশনের নিয়মে টিফিন করা বা দুপুরের খাওয়ার জন্য আলাদা কোনও সময় বরাদ্দ নেই। নিয়ম অনুযায়ী সকাল সাতটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত টানা ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চালাতে হবে। মাঝখানে নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে একে একে খেয়ে নিতে হয়। জয়ন্তরা তাই-ই করবে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু দুপুর একটা নাগাদ আমজাদ আলি দরজার কাছে এসে বলল— হ্যাঁ, হ্যাঁ, খেয়ে আসুন। ঘরটা সিভিক পুলিশের জিম্মায় রেখে ওরা খেতে গেল।

খেয়ে এসে জয়ন্ত দেখল ভোটারদের লাইনে লোক খুব কম। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে সাত-আট জন হবে। সিভিক পুলিশটাকে খেতে যেতে বলে জয়ন্ত নিজের চেয়ারে বসে ভোট নেওয়া শুরু করতে যাবে, এমন সময় বাইরে একটা শোরগোল উঠল। যে ক'জন লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা লাইন ছেড়ে ছুট লাগাল। ব্যাপারটা কী হলো বোঝার জন্য জয়ন্ত বাইরে যাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় মুখে রুমাল বাঁধা পাঁচ-ছ'জন লোক ঘরে ঢুকল হুড়মুড় করে। একজনের হাতে একটা রিভলভার, বাকিদের হতে লোহার রড। জয়ন্তর উল্টোদিকের দেওয়ালের কাছে একটা বেঞ্চে তিনজন পোলিং এজেন্ট বসেছিল, একটা ছেলে তাদেরই একজনের হাতে লোহার রড দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিল। এতেই কাজ হয়ে গেল। এজেন্ট তিনজন প্রায় বেঞ্চ উলটে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জয়ন্তর বাঁ দিকে রমেনবাবু আর অন্য পোলিং অফিসাররা বসেছিল। বাকিরা তাদের সামনে এসে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিতে গেল। রমেনবাবু ব্যালটের বান্ডিলটা বুকের কাছে চেপে ধরে বললেন— এগুলোয় হাত দেবেন না। জয়ন্ত বুঝল রমেনবাবু মানুষটি শুধু দক্ষই নন, সাহসীও বটে। এতক্ষণে রিভলভারধারী লোকটি মুখের রুমাল খুলে ফেলেছিল। সে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে বলল— আপনাদের কোনও ক্ষতি আমরা করতে চাই না। কিন্তু আমাদের তাতে বাধ্য করবেন না। জয়ন্ত অসহায়ের মতো দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, বাইরে কাউকে দেখতে পেল না। সিভিক পুলিশটিকে সে নিজেই খেতে

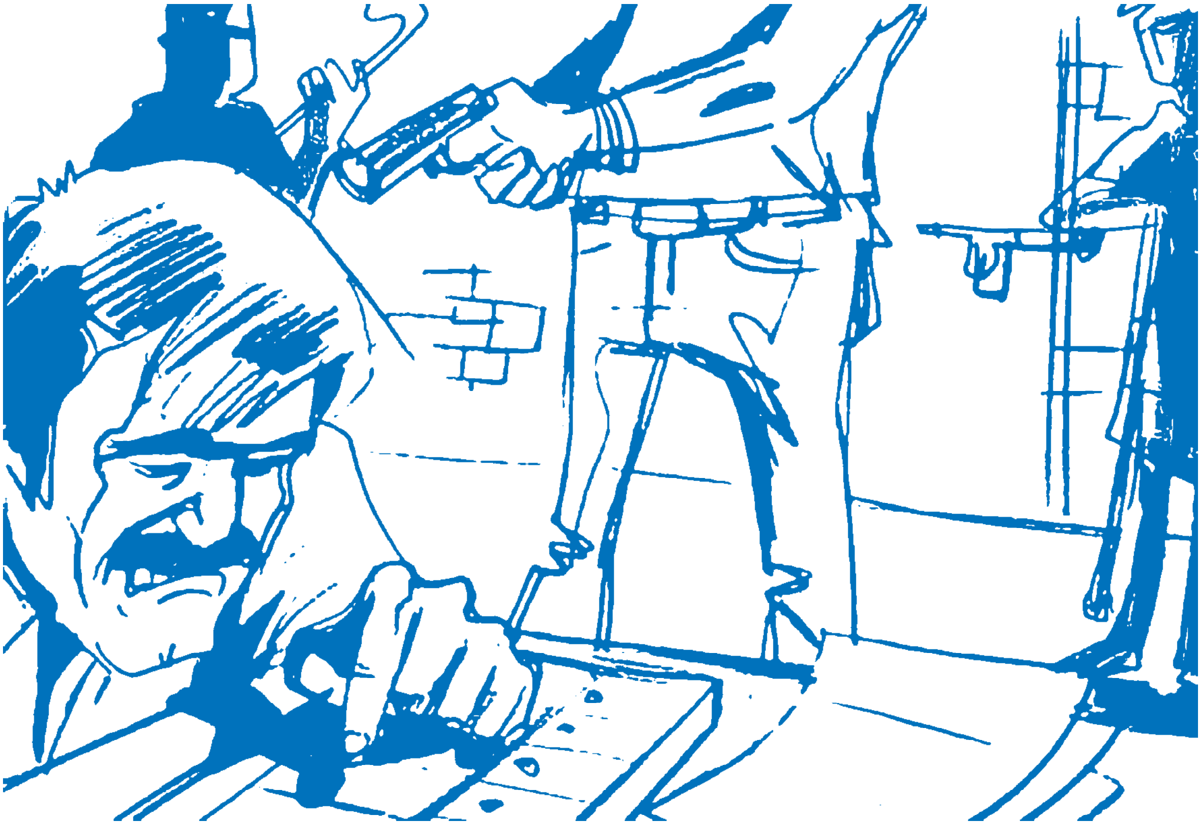

পাঠিয়েছিল পাশের ঘরে, তার আর এ ঘরে আসার সুযোগ হয়নি। কনস্টেবলটিকেও দেখা গেল না। বিপদ বুঝে পালিয়েছে নিশ্চয়ই। থাকলেই বা তারা কী করতে পারত! গুড্ডুর মুখটা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল জয়ন্তর। বাধা দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বুঝে সে রমেনবাবুকে একটু কড়াভাবেই বলে ফেলল— আমি প্রিসাইডিং অফিসার বলছি, আপনি ব্যালট পেপারগুলো দিয়ে দিন। কাজটা ভীরুর মতো হয়ে গেল। কিন্তু কখনও কখনও সাহস দেখাতে যাওয়াটা বোকামির পরিচয়। ততক্ষণে ব্যালট পেপারগুলো কেড়ে নিয়ে বাকিরা তাতে অত্যন্ত দ্রুত স্ট্যাম্প মারছিল।

রিভলভারধারী বলল— কেউ ফোন করার চেষ্টা করবেন না, তাহলে নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনবেন।

ওরা যখন স্ট্যাম্প মেরে ব্যালট পেপারগুলো ব্যালট বাক্সে ফেলতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে জয়ন্ত কমিশনের দেওয়া একটা নম্বরে বি সি মেসেজ পাঠিয়ে দিল। এটা একটা কোড। এর অর্থ বুথ ক্যাপচারড। জয়ন্তর মোবাইল নম্বর রেজিস্ট্রি করা থাকায় সহজেই কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকেরা সব বুঝতে পারবে।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ওরা কাজ সেরে ফেলল। প্রায় চারশো ভোট পড়তে বাকি ছিল। সেগুলো সবই ওরা দিয়ে দিল নিজেদের পছন্দমতো। তারপর জয়ন্তর দিকে ফিরে বলল— আমাদের কাজ শেষ, আমরা চলে যাচ্ছি। এবার আপনাদের কাজ করুন।

জয়ন্তর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল--- আমাদের কাজ করার তো আর কোনও উপায় রাখলে না। পিছনের ছেলেটি একবার তার দিকে ফিরে তাকাল, তারপর সকলেই লাগাল ছুট। পুলিশের গাড়ি এল আরও মিনিট পনেরো পরে। একজন এস আই জয়ন্তর কাছে সব শুনল, তারপর তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠতে বলল। গাড়ি ছাড়ার পর সেকেন্ড পোলিং অফিসার জয়ন্তর কানের কাছে মুখ এনে বলল— এসব ওই আমজাদ আলি লোকটার কাজ।

জয়ন্ত জানতে চাইল—একথা মনে হলো কেন?

ছেলেটি বলল—রাতে আমার ভালো ঘুম হয়নি। ভোরের দিকে একেবারেই ঘুম না আসায় বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় পায়চারি করছিলাম। তখন ওই রিভলভার-হাতে লোকটাকে আমজাদ আলির বাড়ি ঢুকতে দেখি।

জয়ন্ত বলল— ভোরের অল্প আলোয় দেখতে ভুলও হতে পারে। এ নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই। ছেলেটি চুপ করে গেল।

রিসিভিং সেন্টারে পৌঁছে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করল সবাই। ঘটনাটা এখনও দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। জয়ন্তর মনে হলো মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে তারা। কিন্তু এই বেঁচে ফেরার জন্য কতগুলো গুন্ডার কাছে তাদের আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে হয়েছে। ঘটনাটা তাই কুরে কুরে খাচ্ছিল জয়ন্তকে। জয়ন্ত বাকি সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল। একই অনুভূতি কি তাদেরও হচ্ছে? কিন্তু এসব নিয়ে আলোচনা করার মতো সময় হাতে নেই। এখন দ্রুত সবকিছু জমা করার ব্যবস্থা করা দরকার। রিসিভিং সেন্টারটা হয়েছে একটা কলেজের মাঠে বিরাট প্যান্ডেল

করে। জমা নেওয়ার জন্য অনেকগুলো কাউন্টার করা হয়েছে। কাউন্টারের সামনে লেখা রয়েছে সেখানে কোন কোন পোলিং স্টেশনের ব্যালট বক্স এবং ফর্ম জমা নেওয়া হবে। তাদের জান্য নির্দিষ্ট কাউন্টারের সামনে বসে জয়ন্তরা ব্যালট বাক্সগুলো সিল করল, বাকি থাকা ফর্ম ফিলআপ করল, তারপরে জমা দেবার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাউন্টারে দুজন অফিসার কাজ করছিল। তারা ফর্মগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল ঠিকঠাক পূরণ করা হয়েছে কিনা। জয়ন্তর সময় আসতে ওদেরই একজন বলল— ব্যালট পেপার অ্যাকাউন্ট আর প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি আগে জমা দিন। জয়ন্তর হাতে খামে ভরা সব ফর্মগুলো পরপর সাজানোই ছিল। জয়ন্ত দুটো খাম লোকটির দিকে এগিয়ে দিল। লোকটা একটা খাম থেকে ফর্ম বার করে দেখে বলল— এ কী করেছেন! ব্যালট পেপার অ্যাকাউন্ট তো ফিলআপ করেননি। ফিলআপ করে আনুন।

জয়ন্ত বলল— ফিল আপ করার উপায় নেই।

লোকটি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল— মানে?

—আমাদের বুথ দখল হয়েছিল। ওরা অনেক ব্যালট পেপার ছিঁড়ে দিয়েছে, অনেকগুলো পকেটে করে নিয়ে গেছে, ইচ্ছামতো ছাপ্পা মেরে ব্যালট বক্সে ফেলেছে, আমার কাছে কোনও হিসাব নেই। আমি বুথ ক্যাপচারের মেসেজ পাঠিয়েছি, প্রিসাইডিং অফিসারের ডয়েরিতেও সব উল্লেখ করেছি।

এবার অন্য লোকটি বলল— কিন্তু এভাবে তো আমরা জমা নিতে পারব না। আমাদের কাছে সেরকম কোনও নির্দেশ নেই।

—তাহলে কী করতে হবে বলুন?

---আমরা নতুন ফর্ম দিচ্ছি, আপনি ফিলআপ করে দিন। এসব কথা লেখার দরকার কী?

জয়ন্ত বুঝল ওরা ঝামেলা এড়াতে চাইছে। ভোট ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে সে এটা লিখে দিলে ওদের কাজ সহজেই মিটে যায়।

—কিন্তু আমার কাছে তো কোনও তথ্য নেই। তাছাড়া আমি মেসেজ করে দিয়েছি, এখন কোনও সমস্যা হয়নি লিখলে আমি তো পরে বিপদে পড়ব।

---কেউ ওসব মিলিয়ে দেখবে না বুঝলেন। যা বলছি লিখে দিন, আমরাও জমা নিয়ে নিই। নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যান।

এবার অবাক হওয়ার পালা জয়ন্তর। চাইছে কী লোকটা? নিজেদের ঝামেলা এড়াতে না তাকে বিপদে ফেলতে? জয়ন্ত একটু জোর দিয়েই বলল—সে আমি পারব না। আপনি এভাবেই জমা নিন।

লোকটি এবার বিরক্ত হয়ে বলল--- আমরা এভাবে জমা নিতে পারব না। আপনি বিডিওর সঙ্গে কথা বলুন। বলেই পিছনের পার্টির কাগজপত্র দেখতে চাইল।

জয়ন্ত ব্যালট বাক্স এবং অন্যান্য জিনিসপত্র রমেনবাবুর জিম্মায় রেখে বিডিওর খোঁজে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ঘর পাওয়া গেল। কিন্তু তিনি সেখানে নেই। জয়ন্ত ঘরের সামনে অপেক্ষা করতে লাগল। মাধবীকে একবার ফোন করল সে। দুপুরে খাওয়ার পর থেকে আর কোনও খবর নেওয়া হয়নি। কিন্তু গোলমালের কোনও কথা জানাল না, শুধু ফিরতে দেরি হবে এটুকু জানিয়ে গুড্ডুর খবর নিল। ছেলেটা সারদিন বাবা বাবা করে কেঁদেছে, কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়ন্তর চোখটা আবার ছলছল করে উঠল, বুকের কাছে একটা দলা পাকানো ব্যথার অস্তিত্ব টের পেল সে। আজ অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ না করলে ছেলেটাকে হয়তো আর কোনোদিন দেখতেই পেত না। ওদের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারত সে ওই এক বুড়ো অসুস্থ কনস্টেবল আর এক ঢাল তলোয়ারহীন সিভিক পুলিশ নিয়ে?

প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার পর বিডিও সাহেব এলেন। জয়ন্ত সমস্যার কথাটা তাকে বলল। বিডিও সাহেব বললেন— ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার কী দরকার, যা বলছে লিখে জমা দিয়ে দিন।

জয়ন্ত বিস্ময়ের গলায় বলল---কী বলছেন আপনি! তাহলে তো ওই বুথে ভোটটা বৈধ হয়ে যাবে।

—ওসব ব্যাপার নিয়ে আপনার ভাবার দরকার নেই। আপনি ওরা যা বলছে লিখে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়ি যান।

জয়ন্তর কেমন যেন জেদ চেপে গেল। উনি ওই ভোটের প্রহসনটাকে তাকে দিয়ে বৈধ করে নিতে চাইছেন। গুন্ডাগুলোকে সে বাধা দিতে পারেনি তার হাতে প্রয়োজনীয় ফোর্স না থাকায়, কিন্তু ওদের অপারেশন চলার সময় সে মনে মনে হেসেছিল এই ভেবে যে তার রিপোর্টের ভিত্তিতে ভোটটাই তো বাতিল হয়ে যাবে। এসব করে কোনও লাভ হবে না। তাই রিস্ক আছে জেনেও মেসেজটা সে পাঠিয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিডিও সাহেব সে পথটাও বন্ধ করে দিতে চাইছেন। জয়ন্ত জোর দিয়ে বলল— সে আমি পারব না স্যার। বিসি মেসেজ পাঠিয়েছি, শেষে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

বিডিও অনেক করে নরমে গরমে জয়ন্তকে রাজি করানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু জয়ন্ত তার জায়গা থেকে এক চুলও নড়ল না। শেষে জয়ন্তকে রাজি করানো অসম্ভব বুঝতে পেরে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বললেন— ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি, আপনি জমা দিয়ে দিন। তবে এর ফল আপনাকে ভুগতে হবে।

সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে টিভিতে খবর দেখছিল জয়ন্ত। পঞ্চায়েত ভোটে রাজ্যজুড়ে অশান্তির খবর দেখাচ্ছে সব নিউজ চ্যানেলেই। অবাধে বুথ দখল, ছাপ্পা, গুলি, বোমায় রক্তাক্ত গণতন্ত্র। একজন প্রিসাইডিং অফিসর, একটি ভোটের-বয়স না হওয়া শিশু-সহ সাত জনের মৃত্যু হয়েছে, অনেকে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, তাদের কেউ কেউ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের কী চমৎকার নিদর্শন! বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র বলে গর্ব করা তো আমাদেরই সাজে! এসব নিয়েই আলোচনা চলছিল। হঠাৎই আলোচনা থামিয়ে ঘোষিকা বলে উঠল--- নির্বাচন কমিশন নদিয়া জেলার তিনটি বুথে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিয়েছে। বুথের নাম্বারগুলো হলো—। তার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বুথের নাম্বারগুলো ভেসে উঠল টিভির পর্দায়। নম্বরগুলো ভালো করে দেখেই চিৎকার করে উঠল জয়ন্ত— পেরেছি মাধবী, আমি পেরেছি।

মাধবী ছুটতে ছুটতে ঘরে এসে জিজ্ঞাস করল— কী, কী হয়েছে? — আমার বুথে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

■

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।।৪।।

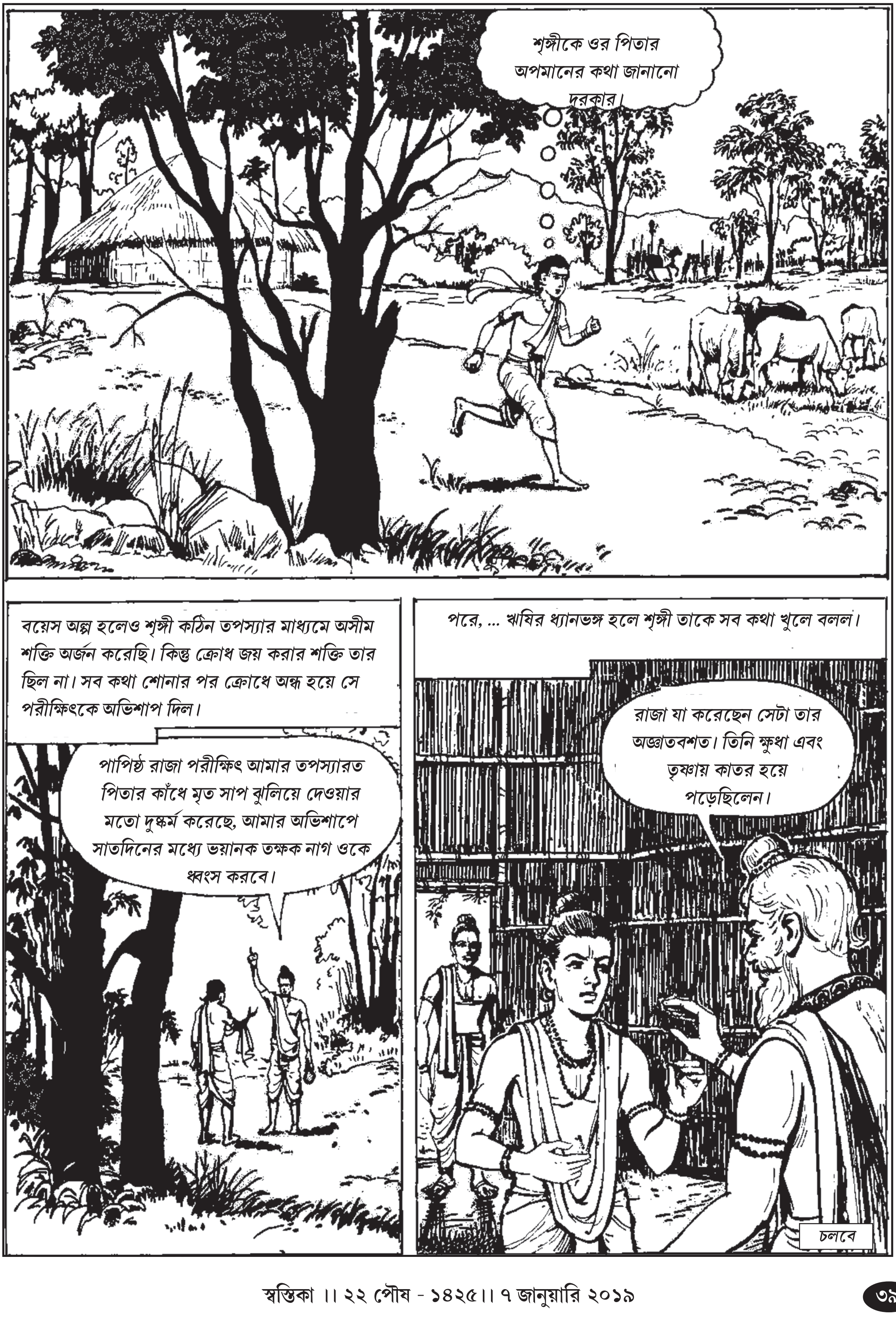

নবাঙ্কুর

ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপ স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজী একবার নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘ আই অ্যাম কনডেনসড্ ইন্ডিয়া’ অর্থাৎ ভারতবর্ষের ঘনীভূত রূপ আমিই। ভারতবর্ষকে ভালোবেসে স্বামীজী হয়ে উঠেছিলেন স্বয়ং ভারতবর্ষ। নিবেদিতাও সেই কথাই বলেছেন, ‘ভারতবর্ষ ছিল স্বামীজীর গভীরতম আবেগের কেন্দ্র... ভারতবর্ষ নিত্য স্পন্দিত হতো তাঁর বুকের মধ্যে, প্রতিধ্বনিত হতো তাঁর ধমনীতে, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর দিবাস্বপ্ন, ভারতবর্ষ ছিল তাঁর নিশীথের দুঃস্বপ্ন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ— রক্তমাংসে গড়া ভারতপ্রতিমা। ... ভারতের আধ্যাত্মিকতা, তার পবিত্রতা, তার প্রজ্ঞা, তার শক্তি, তার স্বপ্ন এবং তার ভবিষ্যৎ--- সবকিছুর তিনি ছিলেন প্রতীকপুরুষ।’

বিদেশ থেকে ফেরবার সময় একজন ইংরেজ বন্ধু স্বামীজীকে প্রশ্ন করেছিলন, পাশ্চাত্যের বিলাস-বৈভবের মধ্যে চার বছর কাটানোর পর তাঁর মাতৃভূমি তাঁর কাছে কেমন মনে হবে। স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, ‘বিদেশে আসবার আগেও আমি ভারতবর্ষকে ভালোবাসতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বাতাস আমার কাছে পবিত্র। ভারত আমার পুণ্যভূমি, আমার তীর্থস্থান।’

জগৎজোড়া খ্যাতি সত্ত্বেও তিনি দেশবাসীর কথা এতটুকুও ভুলতেন না। সব সময় দুঃখী স্বদেশবাসীর কথা ভাবতেন। ধর্মসম্মেলনে তাঁর ঐতিহাসিক বিজয়ের রাতে তিনি এক ধনীর গৃহে অতিথি হলেন। কিন্তু দরিদ্র স্বদেশবাসীর কথা ভেবে বিলাসবহুল বিছানায় ঘুমাতে পারলেন না। সারা রাত মেঝেতেই শুয়ে কাটালেন।

হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির উপর আঘাতও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যখন বিদেশ থেকে ফিরছেন তখন জাহাজে দুজন খ্রিস্টান

মিশনারি গায়ে পড়ে তাঁর সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনায় যখন তারা হারতে লাগলেন, তখন অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় হিন্দু ও হিন্দুধর্মের নিন্দা করতে শুরু করলেন। স্বামীজী যতক্ষণ পারলেন ধৈর্য ধরে থাকলেন। কিন্তু শেষে আর পারলেন না। ধীর পদক্ষেপে একজনের কাছে গিয়ে হঠাৎ করে তাঁর জামার কলার চেপে ধরলেন। তারপর কৌতুকভরে অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন ঃ ‘আবার আমার ধর্মের নামে নিন্দা করলে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।’ সেই মিশনারি তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলছেন, ‘মশাই ছেড়ে দিন, আর কখনও এমন করব না।’ এরপর জাহাজে যখনই তাঁর স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হতো স্বামীজীর সঙ্গে তিনি খুব ভালো ব্যবহার করতেন।

দেশে ফিরে স্বামীজী তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন ঃ ‘ আচ্ছা সিংহ, কেউ যদি তোমার মাকে অপমান করে তখন তুমি কী কর?’ প্রিয়নাথবাবু উত্তর দিলেন ঃ ‘ মশায়, তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে উত্তম শিক্ষা দিই।’ স্বামীজী বললেন ঃ ‘ বেশ কথা! যদি তোমার ধর্মের প্রতি ঠিক সেরকম অচলা ভক্তি থাকত, তাহলে তুমি কখনও একটিও হিন্দুর ছেলেকে খ্রিস্টান হতে দেখতে পারতে না। কিন্তু দেখ, রোজ এ ঘটনা ঘটছে। অথচ তোমরা নীরব রয়েছ। বাপু তোমাদের বিশ্বাস কই? মুখের উপর প্রতিদিন পাদরিরা তোমাদের ধর্মকে অজস্র গালিগালাজ করছে, কিন্তু কজন তার প্রতিকার করার চেষ্টা করছ? তোমাদের মধ্যে কজনের রক্ত গরম হয়ে ওঠে?’

স্বামীজীকে তাঁর বিদেশিনী বন্ধু মিস ম্যাকলাউড প্রশ্ন করেছিলেম, ‘স্বামীজী, আমি কীভাবে আপনাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারি?’ স্বামীজী উত্তর দিয়েছিলেন, ‘ভারতবর্ষকে ভালোবাসো।’

স্বামীজী ভারতবর্ষের অতীত মহিমার কথা শতমুখে বলতেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ অতীতের থেকেও আরও বড়ো হবে। স্বামীজীর জীবনী পড়লে সেজন্য মনে হয় ভারতবর্ষের গর্বে এত গর্বিত বুঝি আর কেউ হননি, ভারতবর্ষের দুঃখে এত বেদনা আর কেউ বুঝি পাননি। আবার ভারতবাসীর অক্ষমতায় এত নির্মম কশাঘাতও বুঝি আর বুঝি কেউ করেননি। কারণ ভারতবর্ষকে এত আপনার করে আর কেউ চেনেননি। মা যেমন সন্তানের সুখ-দুঃখে, ভালো-মন্দ, দুর্বলতা, প্রয়োজন, বিপদ এবং সম্ভাবনার কথা সন্তানের নিজের চেয়েও বেশি করে জানেন, ঠিক তেমনই ভাবে স্বামীজী ভারতবর্ষকে চিনিছিলেন।

(আমার ভারত অমর ভারত থেকে সংগৃহীত)

ভারতের পথে পথে

হাম্পি বা বিজয়নগর

ভারত ইতিহাসের বৃহত্তম হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর রাজাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে কর্ণাটক রাজ্যের উত্তর-পূর্বে ৪৬৭ মিটার উঁচু হাম্পিতে। তেলুগু রাজকুমার হুক্কা ও বুক্কার হাতে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। এক সময় মহম্মদ বিন তুঘলকের কাছে পরাজিত হয়ে মুসলমান হতে বাধ্য হন। পরে শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচার্য গুরু বিদ্যারণ্যের প্রেরণায় হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করে সাম্রাজ্য উদ্ধার করে রাজধানী স্থাপন করেন হাম্পিতে। নাম গ্রহণ করেন হরি ও হর বুক্কা। বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও রাজ্য ও রাজবংশ ১৬৪৬ পযর্ন্ত টিকে থাকে। সূর্যাস্তের সময় হাম্পির ধ্বংসাবশেষ রমণীয় হয়ে ওঠে। নভেম্বর মাসের ৩ থেকে ৪ তারিখ উৎসবে মেতে ওঠে হাম্পি। তখন দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকদের ঢল নামে। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তকমা মিলেছে হাম্পির। রয়েছে পট্টভিরামা মন্দির, বিরূপাক্ষ মন্দির, কোদণ্ডরামা মন্দির প্রভৃতি।

জানো কি?

- স্বাধীনতার পূজারি বলা হয় রাণা প্রতাপ সিংহকে।
- গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপ্রতিপালক ছিলেন ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ।
- মৌর্য সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করেন।
- শৃঙ্গেরীমঠের শঙ্করাচার্য স্বামী বিদ্যারণ্যের প্রেরণায় দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।
- ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের গুরু ছিলেন সমর্থ স্বামী রামদাস।
- শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক করান গাগা ভট্ট নামে কাশীর পণ্ডিত।

ভালো কথা

রাতে কম্বল বিতরণ

খুব শীত পড়েছে। সবাই শীতে জবুথবু হয়ে পড়েছে। চা খেতে খেতে ছোটো কাকু বলল রাস্তার গরিব মানুষরা খুবই কষ্ট পাচ্ছে। ওদের জন্য কিছু করতে হবে। সবাইকে একটা করে কম্বল দিলে কেমন হয়। আমাদের ক্লাবের অভয় জেঠু বলল অত লোককে কি দেওয়া যাবে? দশ জনকে দিলে একশো জন হাজির হয়ে যাবে। ঠাকুমা বলল তোমাদের বাজেট কত? অভয় জেঠু বলল তিরিশ জনের মতো। ঠাকুমা বলল তিরিশটা কম্বল কিনে এনে রাতে যখন ওরা ঘুমিয়ে থাকবে, একটা একটা করে গায়ের উপর দিয়ে আসবে। কেউ জানতেই পারল না, অথচ সেবাকাজ হলো। সেবাকাজ এভাবেই করতে হয়। ঠাকুমার কথামতো জেঠুরা সেদিন রাতে ওভাবেই তিরিশটা কম্বল বিলি করেছে।

শ্রেয়া রায়, নবম শ্রেণী, ফাটাপুকুর, জলপাইগুড়ি।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ল কৃ পা র অ

(২) স্ত ক ম দ পা

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) র দ ক গুা র্ম শ ভা

(২) ৎ চি ক দে স ব কি

১০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অক্ষয়তৃতীয়া (২) ইতরবিশেষ

১০ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন (২) একমেবাদ্বিতীয়ম্

উত্তরদাতার নাম

(১) আলাপন দলই, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। (২) রূপষা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৩) সৌরিন কেশ, তুলসীডাঙ্গা,পূঃ বর্ধমান। (৪) রুনু রায়, গলসী, পূঃ বর্ধমান।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

সুলাগত্তি নরসাম্মা পনেরো হাজার শিশুর ধাইমা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেখানে হাসপাতাল চিকিৎসক ইত্যাদি শব্দ নিতান্তই অপরিচিত সেখানে প্রসূতি মহিলাদের একমাত্র ভরসা শিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত— এমনকী অশিক্ষিত ধাত্রীরা। সন্তানের জন্ম দিতে মাকে সাহায্য করা থেকে শুরু করে সদ্যোজাত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ— সব কাজই তারা করে থাকেন। এটা তাদের পেশাগত কাজ বা পরিচয় হলেও সদ্যোজাত শিশুর কাছে মা যেমন আপন, তেমনই আপন তার ধাইমাও। এই প্রসঙ্গে আমাদের সকলেরই একটা কথা মনে পড়বে। উপনয়নের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁর ধাইমার কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষে নিয়েছিলেন। এই একটি ঘটনা দেখিয়ে দেয় গ্রামাঞ্চলে ধাইমাদের গুরুত্ব কতখানি।

সুলাগত্তি নরসাম্মা এমনিই একজন ধাইমা। সংক্ষেপে আম্মা। পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত আম্মা সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন। রেখে গেছেন পনেরো হাজারেরও বেশি মানবশিশুকে। যাদের তিনি নিজের হাতে লালন-পালন করেছেন। সেইসব সৌভাগ্যবান আজ প্রাপ্তবয়স্ক, স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যরকম এক মাতৃবিয়োগের যন্ত্রণায় কাতর।

মাত্র কুড়ি বছর বয়েসে আম্মা ধাইয়ের কাজ শুরু করেন। সেটা ১৯৪০ সাল। তারপর সাত দশক ধরে তিনি ক্রমাগত কাজ করে গেছেন। পনেরো হাজারেরও বেশি শিশুর জন্ম হয়েছে তার হাতে। কিন্তু এই কাজের জন্য তিনি কারোও কাছ থেকে কোনও পারিশ্রমিক নেননি। পার্থিব প্রয়োজনকে তুচ্ছ করে এভাবে নিজেকে জনসেবায় বিলিয়ে দিতে সবাই পারে না। এই জন্যেই স্থানীয় মানুষজন শ্রদ্ধায় এবং আদরে তাঁকে সুলাগত্তি বলে ডাকতেন। কন্নড় ভাষায় সুলাগত্তি কথাটির অর্থ, সেবিকা।

আম্মা সেবাকাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তার ঠাকুমা মারগাম্মার কাছ থেকে। মারণাগাম্মাও ছিলেন ধাত্রী। একটি ইংরেজি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আম্মা একবার বলেছিলেন, 'ধাত্রীর কাজ আমি শিখেছি ঠাকুমার কাছ থেকে। আমার পাঁচ সন্তানের জন্মও হয়েছিল ঠাকুমার তত্ত্বাবধানে।'

অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন আম্মা। ২০০৭ সালের মধ্যে তার নাম কৃষ্ণপুরার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই বছরেই দুই লেখিকা অন্নপূর্ণা বেঙ্কাটানানজাপ্পা এবং বা হা রামকুমারী তাঁর সন্ধান পান। তাঁদের লেখার সূত্র ধরে একটি জেলাস্তরের পুরস্কারের জন্য আম্মার নাম বিবেচিত হয়। এরপর জেলা ও রাজ্যস্তরের আরও অনেক পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। কিন্তু ২০১৪ সালে এবং তারপর যা হলো তা ইতিহাস। ২০১৪ সালে তুমকুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক ডি. লিট প্রদান করে। গ্রামের সহজ সরল আম্মা হয়ে গেলেন ড. সুলাগত্তি নরসাম্মা। এরপর ২০১৮ সাল। কর্ণাটকের পাভাগাদা তালুকের কৃষ্ণপুরার আম্মাকে পদ্ম-সম্মানে সম্মানিত করল দেশ। নিতান্ত আটপৌরে জীবনের খড়ির দাগ মুছে তিনি এসে দাঁড়ালেন রাষ্ট্রপতি ভবনের উজ্জ্বল আলোর নীচে। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে হুইলচেয়ারে বসা আম্মা যখন পুরস্কার নিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ উপস্থিত সকলেই হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেও মহামানবের সংখ্যা কম নয়। এতদিন তাদের হিসেবের বাইরে রাখা হয়েছিল। তাদের পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল দেশ এটাই চেয়েছিল, দেশ এটাই চায়।

ঠাকুমা তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। স্থানীয় পারিপার্শ্বিক তাকে সাহায্য করেছিল। আম্মার পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, আশেপাশের পাহাড় ও জঙ্গল থেকে বনবাসী গিরিবাসী মানুষ তাদের গ্রামে আশ্রয় নেবার জন্য আসতেন। আম্মা তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। কৃতজ্ঞ মানুষগুলি আম্মাকে ভেষজবিদ্যা শিখিয়েছিল। এই শিক্ষা হয়ে উঠেছিল আম্মার সাফল্যের মস্ত বড়ো হাতিয়ার। আম্মা গর্ভস্থ শিশুর নাড়ি পরীক্ষা করতে পারতেন। এছাড়া শিশুর স্বাস্থ্য এবং কোনদিকে তার মাথা— সে বিষয়ে তার সম্যক জ্ঞান ছিল। এ বছর ২৫ ডিসেম্বর আম্মা মারা গেছেন। দেশ হারিয়েছে এক নিবেদিত প্রাণ সেবিকাকে। আম্মার অভাব সম্ভবত কোনওদিনই পূরণ করা যাবে না। কারণ ধাই থেকে ধাইমা হতে সবাই পারবেন না। ঠিক যেমনটা আম্মা পেরেছিলেন। ■

পাতালচণ্ডীর কালীবিগ্রহ।

গৌড়ের ঐতিহাসিক পাতালচণ্ডী সরকারি উদাসীনতায় নষ্ট হতে চলেছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত

মালদহ জেলার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান গৌড়, আদিনা ও পাণ্ডুয়া সম্পর্কে প্রায় সকলে অবগত থাকলেও আরেক ঐতিহাসিক স্থান 'পাতাল চণ্ডী' আজও আমাদের কাছে অজানা। এই শীতের মরসুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক পর্যটক যখন বনভোজনের জন্য গৌড়, আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট কিংবা অন্যত্র যাওয়ার মনস্থ করেছেন, তখন গৌড়ের গাইড বুকে থাকা গাছপালায় ঘেরা প্রাচীন পাথরের উপরে অবস্থিত পর্যটন স্থান পাতালচণ্ডীর যাওয়ার কথা একবার ভেবে দেখতে পারেন। নিশ্চিতভাবেই এই পাতালচণ্ডীর ঐতিহাসিক পটভুমি রয়েছে।

প্রাচীন সেন বংশের কুলদেবী ছিলেন মা চণ্ডী। সেন বংশের রাজা তৃতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র রাম পাল তৎকালীন রামাবতীতে নিজের রাজধানী নির্মাণ করেন। তাঁর উত্তরসূরি লক্ষ্মণ সেন রামাবতী থেকে দক্ষিণ দিকে নির্মাণ করেন নিজের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী। এই লক্ষ্মণাবতীই আজকের গৌড়। লক্ষ্মণাবতীর চারিদিকে তিন চারটি চণ্ডীমন্দির নির্মাণ করেন। দক্ষিণ দিকের এই মন্দিরটির নামই হচ্ছে পাতাল চণ্ডী। এছাড়া পূর্ব দিকে রয়েছে জহুরা চণ্ডী, পশ্চিমে দুয়ারবাসিনী। উত্তরের চণ্ডীমন্দিরটির এখন অস্তিত্ব নেই বলে অধ্যাপিকা সুস্মিতার গবেষণায় জানা যায়। সেন রাজারা এই পবিত্র পাতালচণ্ডী পীঠকেই প্রাচীনকালে গৌড়ের রক্ষাকর্ত্রী হিসেবে মনে করতেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে কার্জনের ভারত ভ্রমণের সময় গৌড়ের যে ম্যাপ তৈরি করেছিলেন তাতে পাটল চণ্ডী বা পাতাল চণ্ডীর উল্লেখ ছিল বলে ঐতিহাসিক ড. তুষার কান্তি ঘোষের বই থেকেও পাওয়া যায়। তাঁর মতে পাটল চণ্ডী আসলে মা দুর্গার আরেক রূপ। মুসলমান শাসনের সময় এই চণ্ডী মন্দিরগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল।

গৌড় পুণ্ড্রবর্ধনের অজস্র ভক্ত আজ ধনে সমৃদ্ধ, শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত। সেই ভক্তরা আজ এই পীঠটিকে নতুন করে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। মালদা থেকে কালিয়চক অভিমুখে ৩৪ নং জাতীয় সড়কের কাটাগড়ের কাছে ইংরেজ আমলের একটি নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, যেটি এখনও ইংরেজদের নীল চাষিদের উপর অত্যাচারের কাহিনি মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এই প্রাচীন সৌধটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। এই সৌধটি গড়িয়া ইঁট বা ছোটো ছোটো ইঁট দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। গৌড় নগরীর উপকণ্ঠে কালাপাহাড়ের গড় রয়েছে। কাটাগড় থেকে এক কিলোমিটার দূরে মাটির রাস্তা দিয়ে আম বাগানের মধ্যে দিয়ে গিয়ে বিশাল জলাশয়ের উপরে পাথর দিয়ে বাঁধানো এই পাতাল চণ্ডী মন্দিরটি পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এই জলাশয়টি

বন্দরে আসা জাহাজ বাঁধার শিকল।

ফঃ ৬

প্রাচীন বন্দর এখন জলাশয়ের রূপ নিয়েছে।

এক সময়ে গঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং বড়ো বড়ো নৌকা এখানে নোঙর করা হতো। প্রমাণ স্বরূপ বড়ো বড়ো জাহাজ বাঁধার লোহার শিকল পাথরের মধ্যে আজও গাঁথা রয়েছে। ইংরেজ আমলে এই গঙ্গা নদী দিয়েই নীল ও অন্যান্য পণ্য রপ্তানি হতো বলে ঐতিহাসিকের মত। স্থানীয় মহিলারা আজও বাড়িতে বিয়ে, অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষে মুকুট ও পূজার দ্রব্য ভাসাতে পাতাল চণ্ডীর বড়ো জলাশয়ে আসেন। এই স্থানটি থেকে কৃষকরা মটি খুঁড়ে বেশকিছু প্রাচীন মূর্তি পেয়েছে যার মধ্যে কষ্টি পাথরের প্রতিহারী মূর্তি রয়েছে। পাতাল চণ্ডী মন্দিরের একাংশে রয়েছে কালী বিগ্রহ ও চণ্ডীমণ্ডপ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার আট পাতা বৃদ্ধি এবং আংশিক রঙিন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহকদের কথা ভেবে আমরা পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি করিনি, পুরানো দামেই (১০ টাকা) এতদিন আমরা পরিবেশন করে এসেছি। কিন্তু ক্রমাগত ছাপার কাগজ ও অন্যান্য খরচ বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়েই স্বস্তিকার মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে ‘স্বস্তিকা’র প্রতি কপির দাম ১২ টাকা হচ্ছে। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

আশা করি, আমাদের অসুবিধার কথা অনুভব করে আপনারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

মন্দিরটি বিশাল ঝিল বা জলাশয় বেষ্টিত হলেও বর্তমানে গঙ্গার একটি ক্ষীণধারা এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে মধুঘাট নামক স্থান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। মূল গঙ্গা এখান থেকে ২২ কিলোমিটার দূর দিয়ে বয়ে চলেছে। বিরাট জলাশয়, শান্ত ও নিরিবিলি প্রাকৃতিক পরিবেশ, কানে আসে পাখির ডাক। আশেপাশে কোনো বাড়ি ঘর না থাকায়, কিছুক্ষণ থাকলেই যে কারো মন অনাবিল আনন্দে ও শান্তিতে ভরে উঠবে। দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আশেপাশের গ্রাম গোপীনাথপুর, ব্যাসপুর, মধুঘাট ও সুজাপুর থেকে হাজার হাজার মানুষ বাসন্তী পূজা উপলক্ষ্যে চৈত্র মাসে সমবেত হন এই প্রাচীন ও ঐতিহাসিক মন্দিরে। চারদিন ধরে চলে মেলা, বাউল গান ও পূজা। বহু সাধু সন্ন্যাসী ও অতিথির আগমনে গমগম করে স্থানটি। এই ঝিলটিকে বর্তমানে কিছু দুষ্কৃতীরা নিজেদের নামে রেকর্ড করে নেওয়ায় উচ্চ ন্যায়ালয়ের মামলা চলছে। পাতাল চণ্ডী কল্যাণ সমিতি এই ঝিলটিকে তাদের মন্দিরের জায়গা বলে মনে করে এবং নিজেদের দখলে রেখেছে।

এছাড়া প্রতি অমাবস্যায় এবং বৈশাখ মাসের শনি, মঙ্গলবার এখানে ধুমধাম সহকারে চণ্ডী বা কালীপূজা হয়ে থাকে। মালদা শহরের ও আশেপাশের অনেক ভক্ত সেই সময়ে উপস্থিত থাকেন। কাঁচা রাস্তা থাকায় বর্ষাকালে পর্যটকদের এখানে আসতে অসুবিধা হয়। মালদা শহরের ও কাঞ্চনতার, খাসিমারী ও কমলাবাড়ি এলাকার বেশ কয়েকজন প্রকৃতিপ্রেমী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পাতাল চণ্ডী কল্যাণ সমিতি নামক একটি সংস্থা তৈরি করে ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় এই পাতাল চণ্ডীকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন। বিশাল জলাশয়টিকে সংস্কার করে মাছ ধরা, মাছ চাষ ও বোটিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এখান থেকে খুব সহজেই গৌড় যাওয়া যায়। তাঁর জন্যেই সরকারি ভাবে রাস্তা তৈরি করার তোড়জোড় শুরু করেছে পাতাল চণ্ডী কল্যাণ সমিতি। তাছাড়া কাটাগড় থেকে পাতাল চণ্ডী মন্দির পর্যন্ত কাঁচা রাস্তাটি পাকা করার জন্য প্রশাসন টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানানো হলেও রাস্তার জমি পাওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সরকারি ভাবে প্রচারের আলোয় এনে ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই স্থানটি পর্যটন মানচিত্রে যাতে খুব সহজেই জায়গা করে নিতে পারে, তার জন্য সবরকমের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। প্রসঙ্গত, এই পাতাল চণ্ডীকে মালদা জেলা হেরিটেজ কমিটি ‘হেরিটেজ সাইট’ হিসেবে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে।

কিন্তু সরকারি উদাসীনতায় পাতালচণ্ডী তার গুরুত্ব হারাচ্ছে এবং প্রাচীন উঁচু গড় অবহেলার কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মালদা শহর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে এমন একটি মনোরম, দূষণমুক্ত ও শান্ত পরিবেশ একদিকে পর্যটকদের যেমন আকৃষ্ট করতে সক্ষম, তেমনি গোশালা তৈরি করে খাঁটি দুধ ও ঘিয়ের চাহিদা পূরণ করতে ও দরিদ্র ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান করতে নির্মাণে পাতাল চণ্ডী এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পাতালচণ্ডী কল্যাণ সমিতি আজ জল-জঙ্গল- জমি সংরক্ষণ করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করার মহৎ প্রচেষ্টকে বাস্তবায়ন করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করছে।

সেদিনের ফাঁসুড়ে দেখেছিল মৃতদেহকে ফাঁসি দেওয়ার প্রহসন

অমিত ঘোষ দস্তিদার

ইতিহাস! তুমিও কি ফাঁসুড়ে শিবু ডোমের মতো নেশায় আজও বেহুঁশ? শিবু ডোম কিন্তু আজ আর বেহুঁশ নয়, আজ সে স্পষ্ট করে দিয়েছে সবকিছু। কিন্তু তোমার কী হবে ইতিহাস!

শৈলেশ দে'র উদ্যোগে ১৯৬৯ সালের এক শনিবারে কলকাতার লেক গার্ডেন্সের এক বাড়িতে কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তির সহযোগিতায় সেখানে এনে হাজির করা হয়েছিল ফাঁসুড়ে শিবলাল ডোমকে। শিবলাল ডোমের বাড়ি ছিল মজঃফরপুর জেলার বেরিচাপরা গ্রামে। তাঁর মামা বাঁকা ডোমের কাছে সে শিখেছিল ফাঁসি-দেওয়ার পদ্ধতি। শিবুর ছেলে নাটা মল্লিক তো ধনঞ্জয় চ্যাটার্জিকে ফাঁসি দিয়ে মিডিয়ার দৌলতে একসময় রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। মাস্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদার-সহ বহু বিপ্লবীর ফাঁসির কারিগর ছিল শিবুডোম। একজন মুন্সেফের উপস্থিতিতে টেপ রেকর্ড চালিয়ে শিবুডোমের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল শৈলেশ দে'র সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

বিশ্বের ইতিহাসে কেউ কোনওদিন জেলকোড লঙ্ঘন করে রাতদুপুরে ফাঁসি দেওয়ার প্রহসন ঘটানোর কথা শুনেছে কি? বরাবর ফাঁসি দেওয়া হয় ভোররাত্রে। তাজ্জব কাণ্ড! সেদিন ওখানে ফাঁসি দেওয়া হলে রাতদুপুরে। শিবুডোম সেদিন সবকিছু দেখেছিল, কারণ সেদিন হ্যান্ডেলে হ্যাচ্‌কা টান মেরে ছিল শিবুডোমই। একই দিনে, একই সঙ্গে, একই ফাঁসির মঞ্চে প্রাণহীন যে দুটি মৃতদেহ ঝুলে ছিল, তাঁরা হলেন মাস্টারদা সূর্য সেন ও সহকারী নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার। আইনে আছে গলায় দড়ি পরাবার আগে হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে দিতে হবে। কিন্তু ইংরেজ সরকারের কোনও আইন মাস্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদার মানেন না। তাই তাঁরা হাত বাঁধতেও দেবেন না। সাহেবদের হুকুমে গোর্খা সৈন্যরা তাঁদের দু'জনকে মারতে লাগল, কিন্তু তাঁদের হাত বাঁধতে পারল না। তাঁদের মুখে শুধু— বন্দে মাতরম্। সারা রাত ধরে গোটা জেলখানার বন্দি স্বদেশিরা গেয়েছিল— বন্দে মাতরম্। কনডেমড্ রুমে নিয়ে গিয়ে চলেছিল পাশবিক অত্যাচার, দাঁত ভেঙে, চোখ উপ্‌ড়ে দুই মৃতদেহকে আনা হয়েছিল আবার সেই ফাঁসির মঞ্চে। বেহুঁশ দুই দেহের হাত বেঁধে, কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে, দড়ির ফাঁস পরিয়ে, হাতল ধরে জোর হ্যাচ্‌কা টান— ব্যাস, শরীর দুটো অদৃশ্য হয়ে নীচে চলে গেল। এরপর এক প্রহসন থেকে আর এক প্রহসনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল সেদিনের ব্রিটিশ সরকার। গোপনে ব্রিটিশ রণতরী এইচ এম এস এফিংগামে চাপিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গিয়ে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের শবদেহ দু'টির বুকে পাথর চাপিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল বঙ্গোপসাগরের জলে...।

১২ জানুয়ারি ১৯৩৪ মাস্টারদা সূর্য সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়েছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে কোর্ট বসিয়ে অতি সাবধানে বিচারের প্রহসন শেষ করা হয়েছিল। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১নং ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হলো, তা কোনও মামুলি খুনের নয়, অভিযোগ আরও গুরুতর; বলা হলো— "Waging, or attempting to wage war, of abetting waging of war, against the government of India." —আর অভিযুক্ত দু'জনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং কল্পনা দত্ত-র বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল রইল। দুই মৃতদেহকে ফাঁসির মঞ্চে এনে ঘটানো হলো ফাঁসির প্রহসন মূলক নাটক।

মিথ্যা ইতিহাসের সামিয়ানার তলে স্বাধীনতা দিবসের দিন, গণতন্ত্র দিবসের দিন ঘটা করে বাজানো হয় 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে'...।

অপেক্ষা...শুধু অপেক্ষা। দেশের তরুণদের জেগে ওঠার অপেক্ষা। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার অপেক্ষা। রাষ্ট্ররক্ষার দায়িত্ব নেবার অপেক্ষা। অপেক্ষা— সত্যের লক্ষ্যে ইতিহাসকে গড়ে তোলার...। নতুন করে শোনার অপেক্ষা— 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে'।

বিয়াল্লিশ আসনে জয় সহজ হবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই ২০১৯-এর নির্বাচনে ৪২-এ ৪২-র কথা বলুন, সব লোকসভা আসন তো দূরস্থান, সব মিলিয়ে ধমকিয়ে-চমকিয়েও ৩০-এর বেশি আদৌ যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ, তথ্য-পরিসংখ্যান হাজির করে তেমনটাই সন্দেহ করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত ভোটে গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরার আগে পর্যন্ত বিগত বিভিন্ন নির্বাচনে বিজেপি -তৃণমূলের ভোটের হারের (শতাংশের) গ্রাফ ২০১৯-এ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২০১৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল মাত্র তিন শতাংশ। তার আগে ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রাপ্ত ভোট শতাংশ ১৭.০২ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছিল।

একথা ঠিক যে, মোদী ঝড় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও সেবার কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু একথাও ঠিক লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিজেপি বরাবরই কিছু বাড়তি ভোট পেয়েছে। যেমন ২০০৯-এ বিজেপি ৬.১৪ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে ২০০৯ কিংবা ’১১ লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বাম-বিরোধিতার যে ফসল মমতা ব্যানার্জি একক কৃতিত্বে তৃণমূলের ঘরে তুলতে পেরেছিলেন, ২০১৯-এর পরিস্থিতি পুরোদস্তুর আলাদা। ২০১৯-এ বরং তৃণমূল-বিরোধী ভোটের পুরোটাই বিজেপির ঘরে উঠে আসবে, সিপিএম-কংগ্রেসের অস্তিত্ব রাজ্যে এখন সাইনবোর্ডেই, তথ্যাভিজ্ঞমহল তেমনটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, সিপিএম ক্ষমতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর রাজ্যবাসী বহু বছর মনে মনে সিপিএম-বিদ্বেষ পোষণ করে এসেছেন যার সুফল গত বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল পেয়েছিল। সেবার বিজেপির প্রাপ্ত ভোট শতাংশ ছিল ১০.১৬। যা বিগত লোকসভার থেকে প্রায় ৭ শতাংশ কম। সিপিএম-কংগ্রেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জোটকে ঠেকাতে বিজেপির এই ভোট তৃণমূলের দিকে গিয়েছিল বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

তাঁদের এও বক্তব্য, ২০১৮-য় পঞ্চায়েত নির্বাচনের গণতন্ত্রের হত্যা বাদ দিলে ইতিপূর্বে কোনও নির্বাচনেই তৃণমূলের ভোট পঞ্চাশ শতাংশের কাছে পিঠে পৌঁছয়নি। সুতরাং তৃণমূলে বিরোধী পরিসর আগেও ছিল, সিপিএম-কংগ্রের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলিদের ভোট ভাগাভাগির সুবিধাও তৃণমূল পেত। বিরোধী পরিসরে বিজেপির শক্তি যতই বেড়েছে, অন্যান্য বিরোধীরা ততই দুর্বল হয়েছে। এই ট্রেন্ড ২০১৯-এ বজায় থাকলে তৃণমূলের কপালে নিতান্ত দুঃখ আছে বলেই অভিমত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

ভোটের পরিসংখ্যান

নির্বাচন	বিজেপির ভোট শতাংশ	তৃণমূলের ভোট শতাংশ
লোকসভা ২০০৯	৬.১৪	৩১
বিধানসভা ২০১১	৪.০৬	৩৯
পঞ্চায়েত ২০১৩	৩.০০	৪৩.৬৩
লোকসভা ২০১৪	১৭.০২	৩৯.০৫
বিধানসভা ২০১৬	১০.১৬	৪৪.৯১

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় হোমিওপ্যাথি বিল অনুমোদিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে খসড়া ন্যাশনাল কমিশন ফর হোমিওপ্যাথি বিল ২০১৮ অনুমোদিত হয়েছে। এই খসড়া বিলে স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে বর্তমান সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর হোমিওপ্যাথির পরিবর্তে নতুন একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব রয়েছে।

এই খসড়া বিলে তিনটি স্বশাসিত পর্ষদ সহ একটি জাতীয় কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। হোমিওপ্যাথি শিক্ষাপর্ষদকে শিক্ষাপ্রদান ব্যবস্থার যাবতীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মূল্যায়ন ও রেটিং সংক্রান্ত পর্ষদ হোমিওপ্যাথি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন করবে এবং এথিক্স পর্ষদ জাতীয় রেজিস্টার সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করবে। এই খসড়া বিলে অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব রয়েছে। এছাড়া হোমিওপ্যাথি প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকদের নিয়োগ এবং পদোন্নতির পূর্বে গুণমান মূল্যায়ণের জন্য পরীক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে। জাতীয় মেডিক্যাল কমিশনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে হোমিওপ্যাথির মেডিক্যাল শিক্ষায় সংশোধনের প্রস্তাব এই বিলে রয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন পড়ান

আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত তিন মাসে 'আয়ুষ্মান প্রকল্পের' অধীনে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, করোনারি বাইপাস, জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট বা হার্টের ভাল্ব বদলানো এমনকী ক্যানসারের মতো খরচাসাপেক্ষ ও দুরারোগ্য ব্যধিগুলির চিকিৎসা এর মধ্যে হয়েছে। সরকারের তরফে আয়ুষ্মান

ভারত প্রকল্পে এই সূত্রে যে ৮৯৭ কোটি টাকার আগে থেকে ক্যাশলেস চিকিৎসার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে (যা রোগী ভর্তি হয়েছে) তার শতকরা ৭৭ ভাগই এই জটিল চিকিৎসা সংক্রান্ত। ন্যাশনাল হেল্থ এজেন্সি-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই রোগীরা সকলেই সরকারের সম্প্রতি চালু হওয়া স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পের সুবিধাভোগী।

গত অক্টোবর মাসে চালু হওয়ার সময় রোগী ভর্তির সংখ্যা ২ থেকে ৫ হাজার ছিল। এই ডিসেম্বরেই তা ১০ হাজার ছাড়িয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমস্ত হাসপাতালগুলিতে ভর্তির সংখ্যা অক্টোবর থেকে গড়ে ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। লাগু হওয়ার সময় থেকে মোট ৬.৭৩ লক্ষ রোগী হাসপাতালে এসেছেন। উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা ঝাড়খণ্ডের মতো রাজ্যে যেখানে চিকিৎসার হাল বিশেষ খারাপ ছিল সেখানেই হাসপাতাল ভর্তিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড ও বিহারে গত এক মাসে 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পে ভর্তি যথাক্রমে ৭০, ৬৭ ও ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনদায়ী চিকিৎসাগুলির খরচ প্রাইভেট হাসপাতালগুলিতে অত্যন্ত বেশি হওয়ায় তা গরিবের সাধ্যের বাইরে ছিল। সংবাদ সূত্র অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' যা 'আয়ুষ্মান ভারতের'ই একটি অংশ সেই প্রকল্পে প্রায় ১১ কোটি গরিব পরিবারের ৫০ কোটি মানুষকে এই চিকিৎসার সুবিধে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। দেশে মোট চিকিৎসা খরচার ৬২ শতাংশ মানুষের নিজের পকেট থেকে হওয়ায় বহু গরিব মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে যান। সরকার এই অবস্থা বদলাতে বদ্ধপরিকর।

দেশে প্রহরাহীন রেল ক্রসিংয়ের সংখ্যা এখন একটি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রেল দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সারা দেশের ব্রড গেজ লাইনে প্রহরাহীন লেভেল ক্রসিংয়ের সংখ্যা এখন মাত্র একটিতে এসে ঠেকল। দেশে মোট ক্রসিংয়ের সংখ্যা বর্তমানে ৩৪৭৯টি। আগামী মার্চেই বাকি কাজটি হয়ে যাবে। রেলওয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাটো করার ফলে চলতি বছরে ইঞ্জিনের মুখোমুখি সংঘর্ষ বা লাইনচ্যুত হওয়া জনিত ঘটনায় মৃত্যুর হার ৭৫ শতাংশ কমে এসেছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সব রকমের ত্রুটি দূর করার কারণে পাহারাহীন লেভেল ক্রসিংয়ে ২০১৬-১৭ সালে যেখানে ২০ জনের মৃত্যু ঘটেছিল সেখানে চলতি আর্থিক বছরে সেই সংখ্যা তিনে নেমেছে। প্রহরীহীন লেভেল ক্রসিংয়ের মতো দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর করতে রেলমন্ত্রক তিন ধরনের ব্যবস্থা নেয়। বহু ক্ষেত্রে ওভরব্রিজ নির্মাণ, কোনও ক্ষেত্রে আন্ডারপাস আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রহরী নিযুক্ত করে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

সম্প্রতি রেলমন্ত্রক চলতি বছরে তাদের সাফল্যের খতিয়ান প্রকাশ করে রেল যাত্রীদের বাড়তি সুবিধে ও নিরাপত্তা দিতে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার বিস্তৃত তথ্য প্রকাশ করেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৮ সালে নভেম্বর অবধি রেলওয়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা এক ধাক্কায় ২০১৬ সালের ১০৪ থেকে ৪৪এ নেমে এসেছে।

মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের বক্তব্য অনুযায়ী, মুখোমুখি সংঘর্ষ, লাইচ্যুতি ও সবরকমের দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা গত বছরের এপ্রিল ও ডিসেম্বর ১৫ তারিখের মধ্যে বিগত ২০১৭ সালের ২৮ থেকে ৭-এ নেমে এসেছে। শতাংশের হিসেবে দুর্ঘটনার হারে ৭৫ শতাংশের মতো উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেছে।

কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের স্মার্ট সিটি প্রকল্প রূপায়ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় নগর পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে সারা দেশে ২ লক্ষ ৫ হাজার ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে যে স্মার্ট সিটি মিশন রূপায়ণের কাজ চলছে, তাতে ৫ হাজারেরও বেশি শহরের নবীকরণ ও পুনরুজ্জীবন হবে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পৌর)-র অধীনে ৬৫ লক্ষ গৃহ নির্মাণের কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অম্রুত প্রকল্পে শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ, নিকাশি এবং পরিচ্ছন্নতা পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ৭৭ হাজার ৬৪০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। শহরগুলির পরিবহণ ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য দেশের অনেকগুলি শহরে মেট্রো রেল ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্মার্ট সিটি প্রকল্প নির্বাচনের চতুর্থ পর্যায়ে ১০০টি শহরকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ১০০টি শহরে ২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার ১৫১টি প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে। এছাড়াও, ১০ হাজার ১১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩৪টি কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ৪৩ হাজার ৪৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১৭৭টি প্রকল্পের কাজের সূচনা হয়েছে। ৩৮ হাজার ২০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৭৭টি প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শহরে বাসযোগ্যতার নিরিখে ১১১টি শহরের জন্য শহরে বসবাসের সূচক চালু করা হয়েছে। দেশের বেশ কিছু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্মার্ট সিটি ফেলোশিপ এবং ইন্টার্নশিপ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। দেশের বেশ কিছু উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্মার্ট সিটি ফেলোশিপ এবং ইন্টারশিপ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। শহরগুলির মধ্যে উদ্ভাবনী প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছে।

স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় যেসব শহরকে নির্বাচন করা হয়েছে, সেখানকার সড়ক, জল সরবরাহ, সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালে জুলাই মাসে ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা চালু করায় উৎসাহদানের লক্ষ্যে স্মার্ট সিটি ডিজিটাল লেনদেন পুরস্কার চালু করা হয়েছে।

স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধির ওপর তৃণমূলের হামলা, পুলিশের মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা এবং কর্মীরা বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম-১ নিবাসী স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি নেহরু রায়ের ওপর হামলা চালিয়েছে। খবরে প্রকাশ, নেহরুবাবু যখন আউশগ্রাম-১ থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীগঞ্জ থেকে যাদবগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তার সঙ্গে স্থানীয় গ্রামবাসী দুলাল মাহাতোর দেখা হয়। ওরা দু'জনে সাধারণ কথাবার্তা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পর দুলালবাবুর ভাগ্নে আশিস এবং মহাদেব যাদব কোনও প্ররোচনা ছাড়াই নেহরুবাবুকে আক্রমণ করে স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার বন্ধ করতে হুমকি দেয়। নৃশংসভাবে প্রহৃত হন নেহরুবাবু। তার সাইকেল এবং মানিব্যাগ চুরি হয়ে যায়। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে মহাদেব পালিয়ে যায়। আশিসকে আটকে রাখে জনতা। এই সময় চিকিৎসার জন্য নেহরুবাবুকে সরকারি হাসপতালে নিয়ে যাওয়া হয়। নেহরুবাবুর কাছ থেকে সব শুনে চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসা করলেও সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেন। যাই হোক, হাসপাতাল থেকে ফিরে নেহরুবাবু জানতে পারেন, তৃণমূলের নেতারা এসে আশিসকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আশিস এবং মহাদেব এলাকার পরিচিত সিপিএম কর্মী। অথচ তাদের আশ্রয়দাতা তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার, পশ্চিমবঙ্গে স্বস্তিকার জনপ্রিয়তা এবং সম্প্রসারণ আটকাতে তৃণমূল এখন সিপিএমের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়েও নেহরুবাবু হেনস্থা হন। প্রথমে স্থানীয় থানার পক্ষ থেকে তাকে বলা হয় গুসকরা ফাঁড়ি থেকে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। অনুমতি আনতে গেলে নেহরুবাবুকে ফাঁড়িতে আটকে রেখে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকী অবিলম্বে এলাকা ছেড়ে চলে যাবার হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়। বর্ধমানে চালান করে দেবার পর সেখানকার সদর আদালত থেকে নেহরুবাবু জামিন পান। এই ঘটনায় আউশগ্রাম-১ ব্লকের মানুষ ক্ষুব্ধ। তাদের প্রশ্ন, স্বস্তিকা পত্রিকাকে তৃণমূলের কীসের এত ভয়? কী কারণে স্বস্তিকার মতো নির্ভীক জাতীয়তাবাদী একটি পত্রিকার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে? তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও নেতা এইসব প্রশ্নের উত্তর দেননি। তৃণমূলের দলদাস পুলিশও মুখে কুলুপ এঁটে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছে।

বাংলা ছবির রোমান্টিক নায়ক অসিতবরণ

দিলীপ পাল

বাংলা ছবির অন্যতম প্রধান রোমান্টিক নায়ক ছিলেন অসিতবরণ। জন্মেছিলেন ১৯১৫ সালে। অসিতবরণ প্রথম জীবনে বেতার ও গ্রামোফোন কোম্পানিতে তবলাবাদকের চাকরি করতেন। নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে তাঁর তবলাবাদন শুনে অভিনেতা পাহাড়ি সান্যাল তাঁকে অভিনয়ের জন্য নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে নিয়ে আসেন। অসিতবরণ অভিনীত প্রথম ছবি 'প্রতিশ্রুতি'। ছবিটি ১৯৪১ সালে মুক্তিলাভ করেছিল। এ ছবিতে নায়করূপী অসিতবরণ বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। তবে অবশ্য এর জন্য অসিতবরণ দায়ী নন, দায়ী হচ্ছেন স্বয়ং পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র। তাঁর সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবেই অসিতবরণ ব্যর্থ হন। তাঁর ব্যর্থতা অবশ্য মুছে যায় পরবর্তী ছবি নীতীন বসু পরিচালিত 'কাশীনাথ' ছবিতে। ১৯৪৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিতে অসিতবরণের গান ও অভিনয় দুই-ই অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। এই ছবির সুবাদে দর্শকরা বাংলা সিনেমার নতুন গায়ক-নায়ক অসিতবরণকে উল্লাসে বরণ করে। সমালোচকেরা এ ছবিতে নাম ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ও গানের প্রশংসা করেছিলেন। এ ছবিতে অসিতবরণের গাওয়া গানটি হচ্ছে— 'জানি গো জানি, তুমি ডেকেছ মোরে'— তখনকার দিনে গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কাশীনাথ' সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি এবং এই ছবিতে নায়িকারূপে তিনিও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যে সময়, তাঁর মধ্যে অসিতবরণ অবশ্য খুব বেশি ছবিতে নায়ক হননি। 'কাশীনাথ' ছবির পর উল্লেখযোগ্য মাত্র চারটি ছবিতে নায়ক রূপে দেখা যায়— 'নাম সিমি' (১৯৫৭), 'দৃষ্টিদান' (১৯৪৮), 'নিরুদ্দেশ' (১৯৪৯) এবং 'রূপকথা' (১৯৫০)। এইসব ছবিগুলিতে তাঁর অভিনয় এমন কিছু না হলেও, চরিত্রগুলোকে জীবন্ত করে তুলতে তার নিরলস প্রচেষ্টা সত্যিই খুব অবাক করে। যার জন্য অসিতবরণ বাংলা ছবির দর্শকদের কাছে যেন ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। তবে কিছু ছবিতে অসিতবরণের অভিনয় স্নেহময় অভিভাবকের চরিত্রে প্রশংসার দাবি রাখে। তবে পরিণত বয়সে অসিতবরণ অনেক ছবিতে মোটামুটি সু-অভিনয় করলেও, রবীন মজুমদারের মতো তাঁর খ্যাতিও মূলত গানের জন্য। তবে অসিতবরণ ও রবীন মজুমদার বাংলা ছবির জগতে দু'জনের আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে। দু'জনেই ছিলেন সিনেমার গান জানা নায়ক। দু'জনেরই খ্যাতির মূলে গানের গলা। প্রসঙ্গত, অভিনেতা অসিতবরণকে চলচ্চিত্র জগতে নিয়ে আসেন পাহাড়ি সান্যাল। আর রবীন মজুমদারকে আবিষ্কার করেন প্রমথেশ বড়ুয়া। এই দুই সমকালীন নায়ক বাংলা সিনেমার একটা বিশেষ সময় তাঁদের কণ্ঠমাধুর্যে দর্শকচিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁদের সার্থকতা এইখানেই। সুগায়ক তথা অভিনতা অসিতবরণের জীবনাবসান হয় ১৯৮৪ সালের ২৭ নভেম্বর।

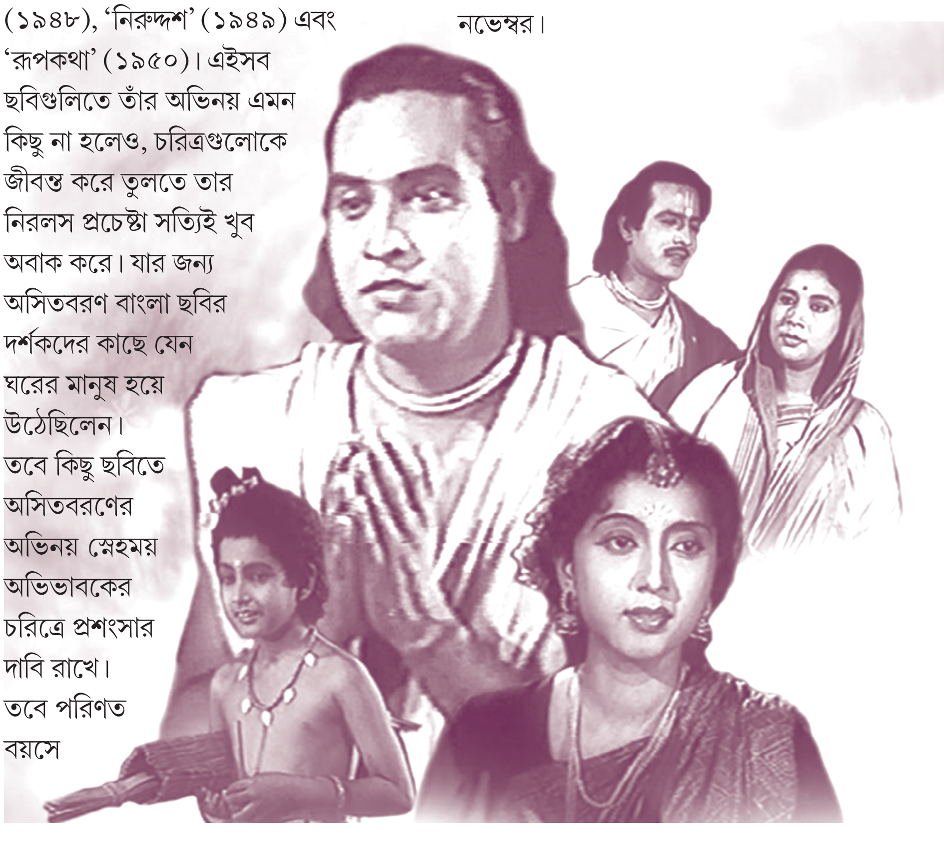

সাপ্তাহিক রাশিফল

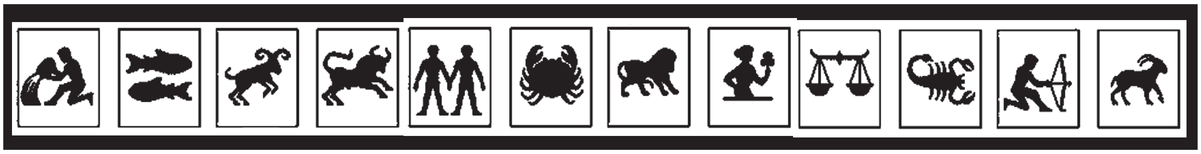

৭ জানুয়ারি (সোমবার) থেকে ১৩ জানুয়ারি (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি-শুক্র, ধনুতে রবি-বুধ-শনি, মকরে কেতু এবং মীনে মঙ্গল। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মকরে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র থেকে মীনে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে।

মেষ : গৃহ ও মাতৃসুখে নেতিবাচক ফল। কথাবার্তা ও লিখিত কাজে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। রিসার্চ স্কলার, প্রযুক্তিবিদ, আইনজ্ঞ, প্রকাশকদের প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। সম্পত্তি বিষয়ে প্রতিপক্ষের বিরূপতায় বিভ্রান্তি, তবে কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশের অবসান। স্বার্থশূন্য, পরদুঃখকাতর এবং বান্ধবীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি। নিজ সিদ্ধান্তে সম্মানিত হলেও ব্যয়াধিক্য যোগ বর্তমান।

বৃষ : কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা ও প্ররোচনায় আর্থিক ক্ষতি। প্রতিবেশীসহ ভ্রাতৃবিদ্বেষে ব্যথিত হবেন। একাধিক উপায়ে আয়ের চিন্তার বাস্তবায়ন। ব্যবসায় বিনিয়োগে বিরত থাকুন। পেশাদারদের খ্যাতি, দায়িত্ব বৃদ্ধি, নিকট ভ্রমণে আনন্দ। সন্তানের মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি, সময়ের অপচয়। গৃহিণীর শরীরের যত্নের প্রয়োজন।

মিথুন : শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক, সঙ্গীতজ্ঞের জ্ঞান-প্রজ্ঞার বিচ্ছুরণ, সম্মান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। রাজনীতি, কূটনৈতিক চালে বিরোধিতা হ্রাস। ব্যবসায় বিনিয়োগে শ্রীবৃদ্ধি। সেবামূলক কর্মে প্রভাবী ব্যক্তির সহযোগিতা ও ভগিনীর বিবাহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্বস্তিকর। বস্ত্র, অলংকার, গৃহসজ্জায় আভিজাত্য বৃদ্ধি।

কর্কট : খনিজ দ্রব্য, পরিবহণ ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত ব্যয়যোগ। পিতা, মাতুল সম্পর্কের শারীরিক নজরদারি প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিক ও স্বজনের অসংগতিপূর্ণ ব্যবহারে ব্যথিত হবেন। সপ্তাহের শেষভাগে স্পষ্ট ও যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার ও যুবক বন্ধুর সাহচর্যে মানসিক প্রশান্তি।

সিংহ : প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সাফল্য। চাকুরিজীবীদের ব্যস্ততা ও চাপ বৃদ্ধি। আইনি জটিলতা ও শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। জেলাশাসক, শল্যচিকিৎসক, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের সাফল্যে সাবলীল গতি ও আর্থিক প্রগতি। গৃহিণীর বুদ্ধিমত্তায় পারিবারিক সমৃদ্ধি ও সমাজ কল্যাণে উৎসাহ বৃদ্ধি। সন্তান- সন্ততির মেধার বিকাশ ও উচ্চশিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি।

কন্যা : পরাক্রান্ত, পরিজনপ্রিয়, ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি, পরিব্রাজক কিন্তু চপল স্বভাবের কারণে সমালোচনা ও বিরোধিতা। ন্যায় শাস্ত্রে আগ্রহী। হঠাৎ ভাগ্যাকাশে নব সূর্যোদয়। বিদ্যার্থী ও কর্মপ্রার্থীদের কাম্য ফললাভ। বয়স্ক বিপরীত লিঙ্গের অনভিপ্রেত ইঙ্গিত বিভ্রান্তিকর।

তুলা : প্রবাসজীবন, দোদুল্যমানতা পরিহার করুন। কর্মক্ষেত্রে অধস্তন কর্মীর আচরণ অসংগত। মান-সম্মানের ক্ষেত্রকে শুভ বলা যায় না। ছোটো ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে বিরত থাকা শ্রেয়। শিল্পরসিক ও সাহিত্য পিপাসুদের সৃষ্টির আনন্দ ও প্রতিভার ব্যাপ্তি। নতুন সুহৃদ সম্পর্কে ইচ্ছাপূরণের সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক : দুরূহ কাজের সমাধানে প্রশংসা ও প্রভাব বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ। ভ্রাতা-ভগিনীর সুখবরে আনন্দ ও প্রীতিবর্ধন। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। গুণী ব্যক্তির সান্নিধ্যে প্রত্যয়দীপ্ত পথচলা। মূত্রাশয়ের জটিলতায় ক্লেশ।

ধনু : কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততায় বিভ্রান্তি মনঃক্লেশ। বিলাসব্যসনে ব্যয়াধিক্য ব্যয়াধিক্য ও আবেগ প্রবণতায় বিশেষ সুযোগ হাতছাড়া হবার প্রভূত সম্ভাবনা। ক্রীড়াবিদ, পুলিশ ও রিপ্রেজেন্টেটিভদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মদক্ষতার অনায়াস সাফল্য। প্রবাসীর স্বদেশে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা। নীতিগত ব্যাপারে সমঝোতা বুদ্ধিমানের কাজ। বাতজ-বেদনা ও হৃদযন্ত্রের ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার।

মকর : গৃহিণী ও গৃহস্বামী উভয়েরই শরীরের যত্নের প্রয়োজন। বস্ত্র, ওষুধ, স্বর্ণ-অলংকার ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ ও সাফল্য। বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে গৃহনির্মাণ বিষয়ে আলোচনা ফলপ্রসূ হতে পারে। এ সপ্তাহের আর্থিক লেনদেন বিষয়ে ইতিবাচক ফলে বাধা। ভ্রমণে অবৈধ সম্পর্কের প্রভাব। প্রতিবাদী মনোভাবে সমাজে সম্মানিত।

কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে নিজ দক্ষতায় নতুন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও কর্তৃপক্ষের শংসা প্রাপ্তি। বেকারদের নতুন কর্মসংস্থান ও পারিবারিক মেলবন্ধন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ঝুলে থাকা সমস্যার সমাধান ও প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিতে সুধারস সঞ্চার। যানবাহন চালকদের সতর্ক ও সমাজ কল্যাণে ব্যয় বৃদ্ধি।

মীন : আলস্য, উদাসীনতায় সময়ের অপচয় ও অপ্রিয় সত্য কথনে ভুল ধারণার সৃষ্টি। ব্যবসায়ীদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও বিদ্যার্থীদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ। সন্তানের অবিধিপূর্বক আচরণ উদ্বোগের কারণ। গৃহশ্রীর পরামর্শ ও কৌশলে পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি। আত্মীয় সমাগমে আনন্দ ও সংবেদনশীলতার সামাজিক স্বীকৃতি।

● জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।

—শ্রী আচার্য্য